রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের প্রতিবাদকে ঘিরে
একটি ই–সংলাপ পৃষ্ঠা ৩

রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের রায়
নির্দেশক অংশটি পৃষ্ঠা ৬

কাকে কোন কোন ধারায় শাস্তি দেওয়া হল পৃষ্ঠা ৭

বিষয় : রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের রায়
ত্রুটিপূর্ণ সাক্ষ্য ও সিদ্ধান্ত পৃষ্ঠা ৮

আদালতে বিনায়ক সেনের বয়ান পৃষ্ঠা ১০

কান্ডালা বালাগোপাল স্মরণে পৃষ্ঠা ১১

ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনে হিংসা ও অহিংসার প্রতিফলন পৃষ্ঠা ১৩

সালওয়া জুডুম নিয়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন পৃষ্ঠা ১৬

অন্ধ্রপ্রদেশের মাওবাদী আন্দোলন পৃষ্ঠা ২৩

উইকিলিকস প্রসঙ্গ পৃষ্ঠা ২০

লিট্‌ল ম্যাগাজিনে বিরুদ্ধ মতপ্রকাশের পরিসীমা পৃষ্ঠা ২

বাইশ বছর বয়সী যুবক, মার্কিন সামরিক বাহিনীর সদস্য ব্র্যাডলি ম্যানিং ইরাকে মার্কিন বাহিনীর অত্যাচারের তথ্য ফাঁস করেছেন।

নভেম্বর–ডিসেম্বর ২০১০ ❒ একাদশ বর্ষ ❒ ষষ্ঠ সংখ্যা ❒ ৬ টাকা

মন্থন
সাময়িকী

তৃতীয় পরিসর

এখন আমাদের ক্ষমতার পরিসরের বাইরে অগণিত জনতার মাঝে এসে দাঁড়ানো দরকার। আমাদের পক্ষে — যারা অনেকদিন ধরে কোন–না–কোন কাজের সঙ্গে লাগাতার যুক্ত রয়েছি — কাজটা কঠিন। এর ওপর আমরা যারা সামাজিক বা বংশমর্যাদা, সহজাত গুণাবলী, ধনসম্পদ, শিক্ষা ইত্যাদির যে কোন একটি বা একাধিক অধিকারে প্রতিপত্তিশালী — এক কথায় নয়া কুলীন (এলিট), তাদের পক্ষে কাজটা আরও কঠিন।

আমাদের সামনে ক্ষমতার দুটো পরিসর স্পষ্টভাবে রয়েছে। এক, রাষ্ট্রীয় বা শাসক ক্ষমতার পরিসর, যাকে **প্রথম পরিসর** বলা যেতে পারে। দুই, বিরোধী ক্ষমতার পরিসর, যা আগামীদিনে ক্ষমতা দখল করতে চায়, যাকে **দ্বিতীয় পরিসর** বলা যেতে পারে।

এর বাইরে বাস্তব জগতে একটা **তৃতীয় পরিসর** রয়েছে। আমরা যদি এখানে এসে দাঁড়াতে চাই, তাহলে প্রথম কাজ হল এই পরিসরকে চেনা। অনেকসময় এই পরিসরে দাঁড়িয়েও আমাদের মনটা পড়ে থাকে প্রথম দুই পরিসরের কোথাও না কোথাও। প্রতিযোগিতায় সাফল্য পাওয়া এবং অপরকে হারিয়ে দেওয়া, স্বীকৃতি বা বাহবা পাওয়ার জন্য আমাদের মন ভিতরে ভিতরে অধীর থাকে। তখন আমাদের অবস্থা হয় এরকমই যেন তৃতীয় পরিসরে থেকেও আমরা নেই।

চিন্তা, অনুভূতি, কর্ম এবং সর্বোপরি জীবনযাপনে আমাদের এই পরিসরের সদস্য হয়ে উঠতে হবে। এই পরিসরের অন্যদের সঙ্গে আমাদের এবং আমার সম্পর্ক হবে **সহযোগিতার**। এই পরিসরের সদস্যতা কোন স্থায়ী ব্যাপার নয়, সতত চলমান, সতত বহমান, প্রসারমান। প্রতি মুহূর্তে এই পরিসর থেকে ব্যক্তি ও গোষ্ঠী প্রথম দুই ক্ষমতার খপ্পরে (পরিসরে) গিয়ে পড়ছে।

তৃতীয় পরিসরের কোন কৌলিন্য নেই; পাতি এবং কোন ক্ষমতার আসক্তি নেই; কেবল রয়েছে **প্রয়োজন মতো ধাক্কা মারা** এবং **পাশ কাটানোর সামর্থ্য** — যা তাদের প্রতিনিয়ত অর্জন করে নিতে হয়।

তৃতীয় পরিসর বৈচিত্র্যময়। আন্দোলনের দিক থেকে, চর্চা ও সৃষ্টিশীল কর্মের দিক থেকে এই পরিসর বিপুল বৈচিত্র্যময়। অপরের আন্দোলন, অপরের বিচিত্র সমস্যা, অপরের বিষয়, অপরের কর্মের প্রতি সহনশীল অংশগ্রহণ ব্যক্তিকে ক্ষমতার নাগপাশ থেকে মুক্ত হতে, নির্বিশেষ হতে সাহায্য করে।

লিট্‌ল ম্যাগাজিনে বিরুদ্ধ মতপ্রকাশের পরিসীমা

সজল রায় চৌধুরি

লেখাটার একটা ভূমিকা দরকার। কেন এই লেখা? 'পর্বান্তর' নামে একটি শিল্পসাহিত্যের পত্রিকা নিজগুণে সুপরিচিত। ধর্ম-দর্শন, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রসঙ্গও গুরুত্বের সঙ্গে এখানে স্থান পায়। উদার মানবিক মূল্যবোধের একটি ভূমিতে এর অবস্থান। আচমকা পত্রিকাটিতে মোহিত রায়ের একটি প্রবন্ধ বেরোয়। মুসলিমবিদ্বেষী এবং সোচ্চার হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদী লেখা। একই সংখ্যায় লেখাটা প্রকাশের প্রতিবাদে সম্পাদকমণ্ডলী থেকে আমার পদত্যাগের চিঠিও গুরুত্ব দিয়ে ছাপা হয়। চিঠিতে আমি লেখাটিকে 'বিষাক্ত আগাছা' বলি এবং 'ছেপে প্রতিবাদ'-এর যোগ্যতা লেখাটির নেই, এমন ইঙ্গিত করি।

আমার এই প্রতিক্রিয়া পর্বান্তরের নিজস্ব বিষয় বলেই আমার ধারণা ছিল। এর যে একটি সাধারণ মাত্রা আছে তা বোঝা গেল 'মন্থন' সম্পাদকের অনুরোধে। তিনি ওই চিঠি প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রশ্ন করেন। তাঁর প্রশ্নের উত্তরেই এই লেখার অবতারণা।

প্রথম প্রশ্ন : কেন লেখাটিকে বিষাক্ত আগাছা বলা হয়েছে

বলা বাহুল্য, বিশদ আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। 'বিষাক্ত আগাছা' একটি সহজ রূপক। আগাছা যেমন বাগানের মূল উদ্ভিদকে নষ্ট করে, আলোচ্য লেখাটি তেমনই পর্বান্তরের উদার প্রগতিশীল মানবতাবাদী মূল সুরকে বিধ্বস্ত করেছে। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে 'পদ্মবনে মত্তহস্তী' বলে একটি চমৎকার রূপক আছে। এক্ষেত্রে সেটি প্রযোজ্য।

আলোচ্য লেখাটিতে বলা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম জনসংখ্যার বেশি বৃদ্ধি চার দশক পরে হিন্দুদের সংখ্যালঘুতে পরিণত করবে, সুতরাং হিন্দুরা সাবধান, কারণ ওরা ভয়ংকর। এই বক্তব্য মোটাদাগের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষপ্রসূত ও উসকানিমূলক। প্রসঙ্গক্রমে লেখক হিন্দু মুসলমান লোকবিনিময়ের কথা নিবন্ধের এক অংশে ছুঁয়ে গেছেন। এই ইঙ্গিত মারাত্মক, যার মানে ethnic cleansing বা বিরুদ্ধ জনগোষ্ঠীকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করা। সোজা কথায় দাঙ্গা লাগিয়ে মুসলিম নিধন করে বা বাংলাদেশে খেদিয়ে হিন্দু-সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে এক 'নিরাপদ পবিত্রভূমি প্রতিষ্ঠা' করা। বেখাপ্পা বলে এটি আগাছা। বিদ্বেষবিষের জন্য এটি বিষাক্ত।

দ্বিতীয় প্রশ্ন : কর্পোরেট মিডিয়া যদি নানা ভিন্নমতের জায়গা দিতে পারে, লিট্‌ল ম্যাগাজিন কেন পারবে না?

কর্পোরেট মিডিয়ায় সবরকম মতের উদার পরিসর মোটেই থাকে না। প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে আমরা নানা মতের প্রতিফলন কখনও কখনও দেখি কীভাবে? উত্তরটাও একটু ভাবলে বোঝা কঠিন নয়। বড়ো বড়ো দেশিবিদেশি বাণিজ্যবাড়ির নিজেদের মধ্যে প্রকাশ্য ও গোপন এক অবিরাম যুদ্ধ চলে। দাঁতে-নখে। নেতা-মন্ত্রী, সরকারি প্রশাসন তথা বেসরকারি আমলাবাহিনী, বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ, পুলিশ ও সামরিক কর্তাব্যক্তি ও বিচারবিভাগের ঘাঁতঘোঁত সবাইকে জড়িয়ে নিয়ে রণকৌশল ঠিক হয়। এজন্য পেশাদার দালাল সংস্থা কাজ করে। নিজস্ব গুপ্তচরচক্রও থাকে। অবশ্য গোটা লড়াইটা চলে পুঁজির লক্ষ্মণরেখার মধ্যে। জনগণের পরিপ্রেক্ষিতে মুনাফার জন্য এমন কোন অপরাধ নেই যা পুঁজি করতে পারে না।

এই রণক্ষেত্রের যোদ্ধাদের সংঘাতে কখনও কখনও একপক্ষ অন্যপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য এটা ওটা গোপন তথ্য, কৃতপাপ অনুগত সাংবাদিক, মিডিয়া বা প্রশাসনের মাধ্যমে ফাঁস করে। কিন্তু মিডিয়া কখনই পুঁজির নিয়ম ও নীতি, যেমন 'দেশপ্রেম', 'জাতীয় স্বার্থ', 'আর্থিক বৃদ্ধির হার', 'ধনী হওয়ার গৌরব' — এগুলোকে লংঘন করে না। এটা গেল সাধারণ বাধ্যবাধকতা, বিশেষ বাধ্যবাধকতা থাকে মিডিয়ার মালিক ও মোটা বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছে। এভাবেই মিডিয়ার পলিসি ঠিক হয়। কখনও কখনও জনমতের চাপ খুব প্রবল হলে, বড়োমাপের ওজনদার লেখকের প্রতিফলিত আলোয় বাণিজ্যিক সাফল্য লাভের জন্য ভিন্নমত প্রকাশের জানালা একটু ফাঁক করে দেয়। তাদের নিরপেক্ষতা দেখানোর জন্য এটা করে। কখনও বা 'যাকে দেখতে নারি তার চলন' একটু বাঁকাভাবেই দেখানো হয়। মোট পরিসরের এক ছোটো ভগ্নাংশ হয় তাদের জন্য। অনুসারী ঘটনাপ্রবাহ পেছনে যেতে যেতে লুপ্ত হয়। সুতরাং বাণিজ্যিক মাধ্যমে সব মতের পরিসর রাখা হয় — এটা একটা অতিকথা।

লিট্‌ল ম্যাগাজিনগুলোও এক একটা নিজস্ব নীতির আওতায় চলে। কোন সাধারণ নীতিমালা 'লিট্‌ল ম্যাগাজিন' নামক প্রজাতির নেই। নিজস্ব নীতিগুলোও কিছুটা ঘোষিত বাকিটা ধারাবাহিক চর্চার মাধ্যমে অর্জিত। বিশেষ লিট্‌ল ম্যাগাজিনের চরিত্রলক্ষণ হিসেবে সেটি পাঠকগোষ্ঠীর কাছে ধরা দেয়। পরিচালক গোষ্ঠী, লেখক ও পাঠকদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এক একটা লিট্‌ল ম্যাগাজিনের নীতি একটা নির্দিষ্ট সুরে বাঁধা হয়ে যায়। সুতরাং বেসুরো কিছু সহজেই কানে বাজে।

ধরা যাক মন্থন সাময়িকীতে চাকরির ইন্টারভিউ বা রূপচর্চার কলাকৌশল নিয়ে কোন নিবন্ধ প্রকাশিত হলে পাঠকদের কাছে বেসুরো লাগতে বাধ্য। যদিও বহু মানুষের কাছে এধরনের বিষয়ের চাহিদা আছে।

তৃতীয় প্রশ্ন : প্রতিবাদের জন্যই কোন বেসুরো লেখা ছাপা যায় কিনা

বিতর্ক ও নানামতের সংঘাত যে কোন জীবন্ত সমাজের বৈশিষ্ট্য। পত্রপত্রিকায় তার প্রতিফলন পড়বেই। কোন পত্রিকায় তার সুরের সঙ্গে সঙ্গতিহীন লেখা না ছাপলেও সে-লেখা যেখানে সঙ্গতিপূর্ণ সেখানে প্রকাশ পাবে। এভাবে নানা পত্র-পত্রিকার অস্তিত্বই এক ধরনের বৌদ্ধিক বিতর্কের জায়গা করে দেয়। এরপরের স্তরে আমরা দেখি এক পত্রিকার লেখা নিয়ে অন্য পত্রিকায় Polemics বা বিতণ্ডামূলক লেখা। সুস্থ বিতণ্ডামূলক লেখার জন্য ভারতীয় দার্শনিক বিতর্কের কায়দায় পূর্বপক্ষ হিসেবে অপরপক্ষের যুক্তিগুলো সাজিয়ে তারপর তাকে খণ্ডন করা হয়। কোন লেখা সবটাই ছাপা হয় না।

কোন কোন বিরল ক্ষেত্রে বিরুদ্ধমতের লেখা পুরোটাই ছাপা যেতে পারে। এক্ষেত্রে একটা কথা মনে রাখতে হবে কোন লেখা সাধারণ লেখার মতো ছেপে দিলে সেটা প্রতিবাদের পৃষ্ঠপট হিসাবে যেমন কাজ করে তেমন সেই বক্তব্য প্রচারও করে দেয়।

প্রতিটি পত্রিকার যেমন একটা নিজস্ব দিগন্ত আছে, তেমন নানা পত্রিকার লেখার দ্বন্দ্বের একটা মহা দিগন্তও বিরাজ করছে, সেটা মানবতাবাদ, স্বাধীনতা ও অধিকারের উদার দিগন্ত। তার আওতায় এসব তর্কবিতর্ক চলে। যেখানে দেখা যায় সেই বৌদ্ধিক চর্চার ভিত্তিটাই নেই, মানববিদ্বেষী বিষয় স্থান পেয়েছে, তাকে প্রচারের সুযোগ দেওয়ার দায় আমাদের থাকে না। সেই প্রবণতার সঙ্গে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের সম্পর্ক, বিতর্কের নয়। জাতপাত, সম্প্রদায় বা নরনারীর একপক্ষের ভূমিতে দাঁড়িয়ে অন্যপক্ষের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচারকে আমরা তীব্র নিন্দাই করতে পারি,

... পরবর্তী অংশ ২৪ পৃষ্ঠায়

রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের প্রতিবাদকে ঘিরে
একটি ই–সংলাপ

২৪ ডিসেম্বর ২০১০ ছত্তিশগড় রাজ্যের রায়পুরের সেকেন্ড অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট অ্যান্ড সেশন কোর্টের বিচারক বি পি শর্মা ৯২ পৃষ্ঠার এক রায় মারফত বিনায়ক সেন, পীযূষ গুহ ও নারায়ণ সান্যালকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দেন। ২৭ ডিসেম্বর ২০১০ এই রায়ের প্রতিক্রিয়ায় ৮১ জন বুদ্ধিজীবী একটি বিবৃতি প্রকাশ করেন। কিছু ওয়েবসাইটে তা প্রকাশিত হয়। ভারতের বাইরের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে নোয়াম চমস্কি এতে স্বাক্ষর করেন। এই বিবৃতিটির বয়ানের অসম্পূর্ণতা আমাদের কাছে ভারতবর্ষের চলমান কালাকানুন বিরোধী এবং রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি–আন্দোলনের পক্ষে হানিকর মনে হয়। এদেশের যে বুদ্ধিজীবীরা এই বিবৃতি তৈরি করেছেন এবং স্বাক্ষর করেছেন, তাঁরা ইদানীংকালে রাষ্ট্রের তরফে প্রতিহিংসাস্বরূপ কালান্তক UAPA, CSPA–র মতো আইন ও সেগুলির অমানবিক প্রয়োগ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন, এটা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। এই মর্মে আমরা মন্থন সাময়িকীর পক্ষ থেকে নোয়াম চমস্কিকে ই–মেল মারফত একটি চিঠি লিখি। সেই চিঠিটি ই–মেলে পত্রিকার পাঠক সহ কিছু বন্ধুদের কাছে পাঠানো হয়। ইন্টারনেটে এই চিঠির জবাব ও প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োচিত সংলাপ গড়ে উঠেছে। ইন্টারনেট সংলাপটি বাংলায় তর্জমা করে প্রকাশ করা হল। মন্থন সাময়িকীর প্রত্যেক পাঠকের কাছে আমরা আবেদন করছি, আপনিও এই সংলাপে অংশ নিন। অনুবাদক জিতেন নন্দী।

২৭ ডিসেম্বর ২০১০, ৮১ জন বুদ্ধিজীবীর বিবৃতি

ছত্তিশগড়ের একটি আদালতের বিচারে মানবাধিকার কর্মী চিকিৎসক বিনায়ক সেনকে রাষ্ট্রদ্রোহী অভিযুক্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়ায় আমরা স্তম্ভিত।

ডাঃ বিনায়ক সেন কখনও কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে হিংসার আশ্রয় নেননি, কখনও কাউকে হিংসার পথে চলতে প্ররোচিত করেননি, কখনও দেশের সাংবিধানিক সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হননি বা ষড়যন্ত্রকে প্রশ্রয় দেননি এবং কখনও এই ধরনের কোন সংস্থার সঙ্গে কোনভাবে যুক্ত থাকেননি। বরং একজন চিকিৎসক হিসেবে তিনি মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন এবং অনেক প্রাণ বাঁচিয়েছেন; একজন মানবাধিকার কর্মী হিসেবে অবহেলিত, দলিত মানুষের সাহায্যের জন্য তিনি সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। এরপরেও তাঁকে এই সাজা পেতে হল, যা কল্পনার অতীত, অবিশ্বাস্য।

তথাকথিত সাংবিধানিক স্বার্থরক্ষার অজুহাতে রাষ্ট্রের এই ধরনের দমননীতি, প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রের সাংবিধানিক স্বার্থকেই আঘাত করে। তা মানুষের কাছে এই বার্তাই পৌঁছে দেয়, ডাঃ বিনায়ক সেনের মতো একজন মানুষের কীর্তিকলাপকে যে রায় 'রাষ্ট্রদ্রোহী' আখ্যা দেয়, সেই রায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো যায় না।

এই মনোভাবের পরিবর্তন আনা জরুরি। এই রায় সংবিধানের মর্যাদার যে ক্ষতি করেছে, তা পুনরুদ্ধার করা উচিত। দেশের উচ্চতর আদালতের উচিত এই মামলার আরও গভীরতর শুনানি করা, শুনানি শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে মুক্ত রাখার ব্যাপারটি সুনিশ্চিত করা এবং যথেষ্ট যুক্তি–বিবেচনার সঙ্গে তাঁর মামলা পরিচালনা করা।

স্বাক্ষরকারী : *প্রভাত পট্টনায়ক, নোয়াম চমস্কি, অমিয় কুমার বাগচি, অশোক মিত্র, আকিল বিলগ্রামি, রোমিলা থাপার, বীণা মজুমদার, যশোধরা বাগচি, উৎসা পট্টনায়ক, মুচকুন্দ দুবে, পার্থ চ্যাটার্জি, এস পি শুক্লা, সি পি চন্দ্রশেখর, টি জয়রামন, জয়তী ঘোষ, শশী কুমার, বি কে চন্দ্রশেখর, বিনোদ রাইনা, ইন্দিরা চন্দ্রশেখর, মুশিরুল হাসান, মোহন রাও, অলোক রাই, প্রবীণ ঝা, জয়া হাসান, অনীতা রাইনা, বিকাশ রাওয়াল, মালিনী ভট্টাচার্য, স্মিতা গুপ্তা, গীতা হরিহরন, অনুরাধা শেনয়, আইজাজ আহ্‌মেদ, নিবেদিতা মেনন, জি অরুণিমা, নীলাদ্রি ভট্টাচার্য, আদিত্য নিগম, চিত্রা জোশী, রাহুল রায়, বিজয় প্রসাদ, রাজীব ভার্গব, সীমা মুস্তাফা, অচিন বানায়ক, পামেলা ফিলপোজ, সেড্রিক প্রকাশ, পার্থ দত্ত, প্রশান্ত ভূষণ, সুমিত সরকার, তনিকা সরকার, হিমাংশু, অবিনাশ ঝা, তিস্তা সেতালবাদ, বদ্রী রাইনা, সুমঙ্গল দামোদরণ, নন্দিনী সুন্দর, এজেসি বোস, পার্থপ্রতিম পাল, সৌম্যজিত ভট্টাচার্য, হর্ষ মান্দার, ভেঙ্কটেশ আথরেয়া, সুশীল খান্না, দীপা সিনহা, দিলীপ সাইমন, রাজর্ষি দাসগুপ্ত, সুরজিত মজুমদার, অঙ্কুর খান্না, প্রফুল্ল বিদোয়াই, আয়েষা কিদোয়াই, প্রদীপ ম্যাগাজিন, ইন্দ্রজিত হাজরা, তুলসী রাম, বিনোদ শর্মা, রাধিকা মেনন, নীরজ জাভেদ, আসাদ জাইদি, কে আর নায়ার, নাসির খান, স্মিথা ফ্রান্সিস, মুরলী কাল্লুমাল, কমলা ভাসিন, প্রবীর পুরকায়স্থ*

২৯ ডিসেম্বর ২০১০, 'বিনায়ক সেনের ওপর বিবৃতি অসম্পূর্ণ'

মাননীয় অধ্যাপক চমস্কি,

বিনায়ক সেন এবং অন্যান্য অভিযুক্তদের বিচারের বিষয়ে আপনাদের বিবৃতির জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। যদিও এই বিবৃতি — যাতে আপনি এবং আরও ৮০ জন স্বাক্ষর করেছেন — প্রকৃত অর্থে অসম্পূর্ণ। বিনায়ক সেনের সঙ্গে আরও তিনজনের ব্যাপারে রায় দেওয়া হয়েছিল। আপনারা এই বাকিদের সম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ করেননি। উপরন্তু, আপনাদের বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, ডাঃ সেন 'কখনও কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে হিংসার আশ্রয় নেননি, কখনও কাউকে হিংসার পথে চলতে প্ররোচিত করেননি, কখনও দেশের সাংবিধানিক সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হননি বা ষড়যন্ত্রকে প্রশ্রয় দেননি', তাঁকেই 'রাষ্ট্রদ্রোহী অভিযুক্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া' বেদনাদায়ক — এই বক্তব্য প্রকারান্তরে তাঁর সঙ্গে অভিযুক্ত তিনজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডকে ন্যায্যতা দান করে।

একথা অনস্বীকার্য যে সিপিআই (মাওবাদী)–এর হিংসাত্মক কার্যকলাপ তাদের নিজেদের উদ্দেশ্য এবং সার্বিকভাবে জনসাধারণ, দুইয়ের পক্ষেই বিপজ্জনক। অভিযুক্ত বাকি তিনজনের মধ্যে দু'জন অন্তত এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে জানা গেছে। কিন্তু যখন রাষ্ট্রের তরফে প্রতিহিংসাস্বরূপ কালান্তক UAPA, CSPA–র মতো আইন লাগু করা হয়, আধাসামরিক বাহিনী দিয়ে গ্রামকে ছেয়ে ফেলা হয়, রাষ্ট্রক্ষমতার বলে নিরপরাধ মানুষকে অত্যাচার আর খুন করা হয় কিংবা সিপিআই (মাওবাদী) তাত্ত্বিক নেতাদের জেলে পাঠানো হয়, দ্ব্যর্থহীন ধিক্কার তখনও জানানো দরকার। দুঃখজনকভাবে, বিনায়ক সেনের ওপর আপনাদের বিবৃতিতে এই সমস্ত ঘটনার বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদও চোখে পড়েনি।

জিতেন নন্দী

সম্পাদক, মন্থন সাময়িকী, একটি দ্বিমাসিক ছোটো পত্রিকা, কলকাতা

২৯ ডিসেম্বর ২০১০, প্রতিক্রিয়া ১

প্রিয় জিতেন,

আপনাদের বাহবা দিই। এই প্রশ্নটিকে স্পষ্টাস্পষ্টি দৃঢ়তার সঙ্গে সামনে আনার জন্য ধন্যবাদ। আসলে আমি প্রশ্নটাকে আরও বৃহত্তর মাত্রায় দেখার চেষ্টা করতে চাইব — আনা সু চি–র লড়াই, এবছর নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য মনোনীত ইরম শর্মিলার লড়াই, উইকিলিকের প্রবর্তক — প্রত্যেকেই সামরিক রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক বা আটপৌরে নির্যাতনের প্রতীক স্বরূপ।

শুভেচ্ছা সহ, চিন্ময় ভট্টাচার্য

২৯ ডিসেম্বর ২০১০, প্রতিক্রিয়া ২

বন্ধু জিতেন,

ঠিক বলেছেন আর খুবই সুলিখিত আপনাদের বক্তব্য। এটা সত্যিই দুঃখের যে বিনায়ক সেনের মুক্তির জন্য আন্দোলনে গ্রিন হান্ট এবং ছত্তিশগড়ের আদিবাসীদের অসীম নিপীড়ন ও হত্যাকাণ্ডের কোন উল্লেখ নেই। হয়তো অনেকে নিজেদের ভিতর বিরোধ সৃষ্টি হওয়ার ভয় পাচ্ছে, তাহলে আমরা মিলব কীসের বিনিময়ে?

আমরা বিনায়ক ও ইলিনাকে ব্যক্তিগতভাবে বহু বছর যাবৎ জানি। ওঁরা বেনারসে আমাদের এখানে এসেছেন, আমরাও রায়পুরে ওঁদের ওখানে গেছি। বিনায়কের গুণাবলী সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই আর এটাও ব্যক্তিগতভাবে জানি, তাঁর ওপর যে দণ্ডাদেশ হয়েছে, তা নিয়ে এক তীব্র জনরোষ সৃষ্টি হবে। কিন্তু এখন তিনি হয়ে উঠেছেন একটি প্রতীক এবং ছত্তিশগড়ের বাস্তবতার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ, সান্যাল ও গুহ সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। এর সূচিমুখ এবং বর্তমান প্রচার-অভিযান নিয়ে বিশেষভাবে ভাবা দরকার, যাতে তা এমন এক রাজনৈতিক পরিসর গড়ে তোলার কাজে সবচেয়ে বেশি লাগতে পারে, একমাত্র সেটাই এই অঞ্চলের মানুষকে অপরিমেয় শোষণ আর অমানবিক অবস্থা থেকে রেহাই দিতে পারে। এই অমানবিক অবস্থায় তারা বাস করতে এবং মরতে বাধ্য হয়, তাতে তাদের কোন কসুর নেই।

যাবতীয় সরকার আর আদালতগুলো খুব স্পষ্টভাবেই বেশি বেশি করে এমন এক ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠছে, যা বিশ্ব জুড়ে গড়ে উঠছে। এটা আমেরিকারই নির্দেশিত পথ, একের পর এক ইরাক ও আফগানিস্তান আক্রমণের মধ্য দিয়ে তা গড়ে উঠেছে, এর বিরুদ্ধে বিশ্ব জনমতের তারা তোয়াক্কা করেনি। গত শতাব্দীর ত্রিশের দশকে আমাদের এই ধরনের ঘটনাবলীর নজির রয়েছে। আন্তর্জাতিক লগ্নিপুঁজিকে এই ধরনের রাজনৈতিক ঘটনার মূল ভিত্তি ও উৎস হিসেবে মনে করা হয়। সাধারণ লোক বা প্রত্যেক পরিবার একে বিশ্ববাজার নামে চেনে। এই বিশ্ববাজারের অঙ্গ স্বরূপ পেশাদার শ্রেণী প্রচুর মাইনে পায় আর তারা অত্যাধুনিক শহুরে জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। তাহলে এই রাজনৈতিক ঘটনাবলীর সঙ্গে পেশাদার শ্রেণীর বেড়ে ওঠাকে কি আলাদা করা যায়?

ছত্তিশগড় এবং অন্য অঞ্চলের আসল বিষয়গুলোকে স্পর্শ না করে ওপরে ওপরে বিনায়ক সেনের ওপর দৃষ্টিপাত করে সংলাপের ক্ষেত্রটিকে সংকুচিত করে ফেলা হচ্ছে। যাই হোক, প্রচার-অভিযানের যে বিস্তার ঘটছে সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। হয়তো এর মধ্যে আরও বৈচিত্র্যপূর্ণ রাজনৈতিক মতের জন্য আরও কিছুটা উন্মুক্ত জনপরিসর গড়ে ওঠার সুযোগ মিলতে পারে। বিনায়ক সেনের মুক্তির জন্য প্রচার-অভিযানে আন্তরিকভাবে কাজ করার পাশাপাশি আমাদের বক্তব্যটা সামনে রাখা — যেটা আপনারা ইতিমধ্যেই করেছেন — কেন দরকার তা বুঝতে হবে।

শ্রদ্ধার সঙ্গে —

সুনীল সহস্রবুদ্ধে, বেনারস, বিদ্যাশ্রম

২৯ ডিসেম্বর ২০১০, প্রতিক্রিয়া ৩

হ্যাঁ, বিবৃতিটার মধ্যে একটা বড়ো মাপের লঘু আপোস রয়েছে। যে স্তরের লোকেরা এতে স্বাক্ষর দিয়েছেন, তাঁদের দিক থেকে এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এই প্রচার-অভিযানে অন্য কিছু বিবৃতি তুলনায় ভালো। 'সংহতি'-র সাইটে দেখুন, http://sanhati.com/senverdict2010/,এটা পাওয়া যাবে। সংহতি নিজেও শীঘ্রই এই রায়ের সঙ্গে বৃহত্তর বিষয়গুলোকে যুক্ত করে একটা বিবৃতি দেবে।

অমিত বাসোলে, ইউনিভার্সিটি অফ ম্যাসাচুসেট্স, আমহার্স্ট

২৯ ডিসেম্বর ২০১০, প্রতিক্রিয়া ৪

জিতেনবাবু,

এটা ডাঃ সেনের জন্য একটা প্রচার-অভিযান। এটাকে সেভাবেই করা যাক। কিন্তু আমাদের অন্যদের জন্যও আওয়াজ তোলা উচিত। বিশেষত সরকার পোষিত হিংসার সঙ্গে যুক্ত নীতি ও প্রক্রিয়া নিয়ে বলা উচিত। গ্রিন হান্টের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের নামে ইতিমধ্যেই তা চলছে। আমাদের আরও অনেক রকম প্রতিবাদ করতে হবে। আমরা ডাঃ সেনের প্রচার-অভিযানে যুক্ত সকলকেই এব্যাপারে আবেদন জানাতে পারি। কিন্তু সেটা আলাদাভাবে চলুক।

কল্যাণী কান্দাহার মীনা, রাঁচি

২৯ ডিসেম্বর ২০১০, প্রতিক্রিয়া ৫

বন্ধু জিতেন, বুদ্ধেজি, অমিত,

আপনারা যেভাবে বলেছেন, নজরটা কারণ থেকে সরে গেছে আর একটা বিশেষ ফলাফলের মধ্যে আটকে গেছে। হয়তো এটাই সঠিক সময়, যখন এ বিষয়ে আর একটু স্বর তোলা যায়।

আদিবাসী মানুষের অধিকার নিয়ে কথা বলার একটা পন্থা হল জ্ঞান-প্রশ্ন তোলা। হয়তো এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পন্থা, অন্তত আমাদের কারও কারও কাছে।

বুদ্ধেজি কি এ নিয়ে একটা ইন্টারনেট-আলোচনার সূত্রপাত ঘটাতে পারেন? আমরা সকলেই তাতে অংশ নিতে পারি, যেমন জিতেন বেশ ভালোই করেছে। এর ফল (অথবা ফলগুলো, একাধিক প্রবন্ধও হতে পারে) 'কাউন্টারকারেন্ট' ধরনের মাধ্যমগুলোতে প্রচারের জন্য দেওয়া যেতে পারে। সারা বিশ্বে প্রচুর মানুষ এই ই-জার্নালগুলো দেখে। এতে আমরা কিছুটা প্রতিক্রিয়াও পাব। আপনারা কি মনে করেন?

শ্রদ্ধা সহ

অশোক চট্টোপাধ্যায়, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

৩০ ডিসেম্বর ২০১০, প্রতিক্রিয়া ৬

জিতেনদা,

একটা 'জনপ্রিয়' ধিক্কারের অভ্যাসকে বিচারমূলকভাবে দেখার জন্য ধন্যবাদ।

অঙ্কুর রায়চৌধুরি, কলকাতা

৩১ ডিসেম্বর ২০১০, প্রতিক্রিয়া ৭

আপনাদের মতামতের জন্য ধন্যবাদ। খোলসা করি, এটা আমার বিবৃতি নয়। স্বাক্ষর দেওয়া ছাড়া আমার এতে কিছুই করার ছিল না। যাঁরা এটা লিখেছেন, আবেদন হিসেবে বিতরণ করেছেন এবং আপনাদের পেশ করা বিষয়গুলোর সঙ্গে পরিচিত বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে, আপনারা আপনাদের মন্তব্যগুলো তাঁদের কাছে পাঠান।

নোয়াম চমস্কি

৩১ ডিসেম্বর ২০১০, প্রতিক্রিয়া ৮

প্রিয় জিতেন নন্দী

আমি নোয়াম চমস্কির কাছে আপনাদের প্রশ্নের উদ্দেশ্যটা বুঝতে চাই। বিনায়ক সেনকে সমর্থন করার অর্থ নারায়ণ সান্যালকে খাটো করা বা তাঁর সম্পর্কে বিচার করতে যাওয়া নয়। যাই হোক, এটা বোঝা উচিত যে দুজনের রাজনীতি আলাদা আর জনমনে স্পষ্টত এই তফাতটা রয়েছে। জনসাধারণ যে কোন ধরনের রাজনীতির প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করতে পারে। কেউ তাদের রাজনীতি কী হওয়া উচিত তা নিয়ে নির্দেশ দিতে পারে না।

ইলিনা সেন, রায়পুর, ছত্তিশগড়

৩১ ডিসেম্বর ২০১০, প্রতিক্রিয়া ৯

প্রিয় জিতেন নন্দী,

আমার মনে হয়, আমাদের দুই স্তরে সংগ্রাম চালাতে বা তাতে যুক্ত হতে হবে। এক, উদার মানবতাবাদী বুদ্ধিজীবীদের উদ্যোগগুলিকে সমর্থন করার স্তরে, যারা কেবল বিনায়ক সেনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডকে নিন্দা করছে (স্রেফ বিচার বিভাগের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আইনি ব্যবস্থার লঙ্ঘনের দৃষ্টিকোণ থেকে); অন্য স্তরটি হল সংগ্রামকে খোদ আইনি ব্যবস্থার প্রচলিত ত্রুটিগুলিকে চ্যালেঞ্জ জানানোর বৃহত্তর এলাকায় প্রসারিত করা এবং নারায়ণ সান্যালের মতো মাওবাদী সমেত সমস্ত রাজনৈতিক বন্দির মুক্তি দাবি করা (তার সঙ্গে যুক্ত থাকার দোষে পীযূষ গুহের মতো যাদের ধরা হয়েছে)। কেবল বিনায়ক সেনের ওপর থেকে যাবজ্জীবন রদ করার বিবৃতিতে স্বাক্ষর দিয়ে চমস্কি অবশ্যই সঠিক কাজ করেছেন। কারণ একজন মানবাধিকার কর্মী হিসেবে সেনের স্বীকৃতির প্রেক্ষিত থেকে তিনি সেটা করেছেন। আমাদের চমস্কির মতো বুদ্ধিজীবীদের বিরোধী করে তোলা উচিত নয় (তাঁকে 'অসম্পূর্ণ' হিসেবে অভিযুক্ত করে)। বিনায়ক সেনের পক্ষে তাঁর কন্ঠস্বর অবশ্যই ভারত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য আমাদের ব্যাপকতর সংগ্রামে সাহায্য করবে। এই রাষ্ট্র তার আভ্যন্তরীণ নীতিগুলির জায়গায় স্বৈরাচারী, অথচ বিশ্বের কাছে গণতন্ত্রের ভণিতা করে। যে বিবৃতিতে চমস্কি স্বাক্ষর দিয়েছেন (আমি জানি না কে এটা রচনা করেছেন, কিংবা আর কারা এতে স্বাক্ষর দিয়েছেন) তা আপনাদের কাছে 'অসম্পূর্ণ' মনে হতেও পারে। কিন্তু তা বিশ্ব জনমতের কাছে গুরুত্ব পেয়েছে। কেন আপনি বা আপনাদের বন্ধুরা, যাঁরা এখন অভিযোগ তুলছেন, একটা 'সম্পূর্ণ' বিবৃতি রচনা করে আলোচ্য বিবৃতিতে স্বাক্ষর দেওয়ার আগেই চমস্কির কাছে আবেদন করেননি?

তাছাড়া, আমরা সমস্ত স্তরের বুর্জোয়া উদার বুদ্ধিজীবীদের আমাদের সকল মতের সঙ্গে 'সম্পূর্ণ' ঐকমত্য আশা করতে পারি না। যেমন, অপারেশন গ্রিন হান্ট ও অত্যন্ত নির্মম আইনকানুনের প্রতি আমাদের বিরোধিতা অথবা মাওবাদী বন্দিদের মুক্তির প্রয়োজনীয়তা। এইসব বুদ্ধিজীবীদের সংবেদনশীল করে তোলার এক দীর্ঘ লড়াই আমাদের দরকার (এরা সমাজে নিজেদের সুবিধাজনক অবস্থানের জন্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে একটা দৃঢ় অবস্থান নেওয়ার ব্যাপারে সাবধানী)। পুরো নীরব না থেকে এদের একাংশ (যাঁরা বিবৃতিতে স্বাক্ষর দিয়েছেন) বিনায়ক সেনের পক্ষে এগিয়ে এসেছেন। আমরা কি তাঁদের স্বাগত জানাব না? আমাদের পরের ধাপ হবে, অন্য রাজনৈতিক বন্দিদের বিষয়ে এঁদের রাজি করানো এবং যেসব অতি নির্মম আইনকানুনের বলে তারা কারারুদ্ধ রয়েছে, তার প্রতিবাদ করা। চমস্কি এবং অন্য স্বাক্ষরকারীদের সম্পর্কে 'অন্যদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডকে ন্যায্যতা দান করে' অভিযোগ না করে এটা একটা বন্ধুত্বপূর্ণ উপায়েই হতে পারে। অতীতে বাম আন্দোলন বহু সহানুভূতিশীল বুদ্ধিজীবীর ওপর এই ধরনের বেপরোয়া অভিযোগ করে তাঁদের হারিয়েছে (যেমন, 'যদি আপনি আমাদের মতের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত না হন, তাহলে আপনি পশ্চিমি সাম্রাজ্যবাদের সেবা করছেন!')। আমরা যেন সেইসব ভুলের পুনরাবৃত্তি না করি এবং আমাদের আন্দোলনকে পঙ্গু না করে তুলি। আমাদের মনে রাখতে হবে যে এক দীর্ঘ লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে আমাদের যেতে হবে এবং এমন এক শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের লড়তে হবে, যে আমাদের চেয়ে অনেক শক্তিশালী। এই লড়াইয়ে আমাদের সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্য থেকে মিত্র পেতে হবে। চমস্কির মতো বুদ্ধিজীবীরা নয়া উদারনৈতিক বিশ্বব্যবস্থার সমালোচনা করে এবং সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যকে তুলে ধরে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি কেবল মিত্রই নন, বর্তমান পুঁজি-বিরোধী আন্দোলনের এক সক্রিয় অংশগ্রহণকারী।

এই গল্পের আর একটা দুঃখজনক দিক রয়েছে। যদিও আমরা বেআইনিভাবে কারারুদ্ধ নারায়ণ সান্যাল সহ অন্য মাওবাদী ও রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তির জন্য প্রচার-অভিযান গড়ে তোলার চেষ্টা করছি, সান্যালের অনুগামীরা — ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ এবং অন্যত্র মাওবাদী কর্মীরা — কাণ্ডজ্ঞানহীন হিংসায় ইন্ধন দিচ্ছে এবং সাধারণ গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠেছে। এটা আপনারা সঠিকভাবেই বলেছেন যে তাদের এই কাজ 'তাদের নিজেদের উদ্দেশ্য এবং সার্বিকভাবে জনসাধারণ, দুইয়ের পক্ষেই বিপজ্জনক'। নিজেদের আত্মবিধ্বংসী কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে মাওবাদীরা কতদিন জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে যাবে এবং তাদের নিজেদের নেতাদের মুক্তির পক্ষে জনমত গড়ে তোলায় আমাদের উদ্যোগকে বানচাল করতে থাকবে?

সুমন্ত ব্যানার্জি

১ জানুয়ারি ২০১১, প্রতিক্রিয়া ১০

জিতেন

চমস্কির মতো শুভবোধসম্পন্ন মানুষদের সম্পর্কে অভিযোগ না করা বা বিচ্ছিন্ন না করে ফেলার কথাটা ঠিক আছে। কিন্তু এই ধরনের বিবৃতি এবং তার প্রতিক্রিয়া চলতে থাকা দরকার, যাতে একটা পরিসর গড়ে উঠতেও পারে, যেখানে কেউ আরও ব্যাপকতর এবং আরও প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো হাজির করতে পারে। তোমরা সেরকম একটা বিষয় তুলেছ, যেখানে তোমরা রাষ্ট্রের দিক থেকে প্রতিহিংসা নেওয়ার ব্যাপারে প্রশ্ন তুলতে চাইছো। এই প্রশ্নকে এরকম 'রাষ্ট্র-বিরোধী' কাজকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা অবধি বাড়িয়ে নেওয়া যেতেও পারে। সত্তরের নকশাল আন্দোলনকে 'গুঁড়িয়ে দেওয়া' হয়েছিল কীসের জন্য? এইসব আন্দোলনকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টাগুলো আসল বিষয়গুলোকে ধরতে ব্যর্থ হয়, যার সূত্রে এইসব আন্দোলনকে গড়ে ওঠে। দ্বিতীয় আর একটা পয়েন্ট হল, যেসব আইনের বলে এই বিচারগুলো হচ্ছে, সেগুলো সম্পর্কে কী বলা হবে? ঔপনিবেশিক ব্যবহারশাস্ত্র ও প্রশাসন অব্যাহত রাখার সম্ভাবনাগুলোকেও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

কথাবার্তা চলুক, যদি সম্ভব হয়, মেজাজের রুক্ষতা এড়িয়ে।

সৌরীন ভট্টাচার্য, কলকাতা

৩ জানুয়ারি ২০১১, প্রতিক্রিয়া ১১

অধ্যাপক প্রভাত পট্টনায়ক, অধ্যাপক অমিয় কুমার বাগচি, ডঃ আদিত্য নিগম, অধ্যাপক জয়তী ঘোষ, অধ্যাপক উৎসা পট্টনায়ক, ডঃ কে আর নায়ার, শ্রীমতী কমলা ভাসিন, ডঃ মুরলী কাল্লুমাল, শ্রী প্রফুল্ল বিদোয়াই, অধ্যাপক নীলাদ্রি ভট্টাচার্য, ডঃ প্রবীণ ঝা, ডঃ রাহুল রায়, ডঃ স্মিথা ফ্রান্সিস, অধ্যাপক সুমঙ্গল দামোদরণ, অধ্যাপক নন্দিনী সুন্দর এবং বিনায়ক সেনের রায়ের ওপর বিবৃতিতে অন্য স্বাক্ষরকারীদের প্রতি

৮১ জন বিদ্বান ও বুদ্ধিজীবীর স্বাক্ষরিত বিবৃতির ওপর আমার পর্যবেক্ষণ আমি লিখে অধ্যাপক নোয়াম চমস্কির কাছে পাঠিয়েছিলাম, যেহেতু আমার মনে হয়েছিল তিনিই এই বিবৃতিটি সংগঠিত করেছেন (দ্য হিন্দু-তে ২৯ ডিসেম্বর ২০১০-এর "চমস্কি, রোমিলা থাপার বিনায়কের দণ্ডকে নিন্দা করলেন" শীর্ষক প্রতিবেদন দেখুন)। তাঁর প্রতিক্রিয়ায় চমস্কি আমাকে আমার মন্তব্যগুলি বিবৃতির সংগঠক ও লেখকদের কাছে পাঠানোর পরামর্শ দেন এবং এটাও স্পষ্ট করে দেন যে তিনি কেবল ওতে স্বাক্ষর দিয়েছেন। অতএব আমি অন্য স্বাক্ষরকারীদের ই-মেল ঠিকানা খুঁজি এবং

কয়েকজনেরটা প্রকাশ্য পরিসর থেকে পাই। এখন আমি আমার পর্যবেক্ষণ আপনাদের কাছে এবং অন্য স্বাক্ষরকারীদের কাছে পাঠাচ্ছি। যদি সম্ভব হয়, তাহলে এই পর্যবেক্ষণটি অন্যদের পাঠিয়ে দিন, কারণ তাঁদের ই-মেল ঠিকানা আমি খুঁজে পাইনি। দয়া করে লক্ষ্য করুন : সংশ্লিষ্ট রায়টির বিরুদ্ধে প্রচার-অভিযানের ওপর এক গঠনমূলক সংলাপ চালানোর জন্যই এই পর্যবেক্ষণ।
সংহতি সহ
জিতেন নন্দী

৮ জানুয়ারি ২০১১, প্রতিক্রিয়া ১২
অধ্যাপক নোয়াম চমস্কি
আপনার পরামর্শ মতো ৮১ জন বিদ্বান ও বুদ্ধিজীবীর স্বাক্ষরিত বিবৃতির ওপর আমি আমার মন্তব্যগুলি বিবৃতির আবেদনকারী ও লেখকদের কাছে পাঠিয়েছি। আমি তাঁদের দশজনকে ৩ জানুয়ারি ২০১১ সরাসরি ই-মেল পাঠিয়েছি। তাঁরা এখনও কোন জবাব দেননি। আসলে আমি আপনার মতো ব্যস্ত একজন মানুষকে বিরক্ত করতে চাই না, অন্য স্বাক্ষরকারীদেরও কোন সমালোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি বিষয়টির ওপর একটা কথাবার্তা চালানোর জন্যই কিছু পয়েন্ট উঠিয়েছি। আমি অন্য স্বাক্ষরকারীদের সঙ্গেও যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি। আমার মনে হয়, আপনিও রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগে বিনায়ক সেন এবং অন্যদের বিচারের ওপর একটা সংলাপ গড়ে তোলার জন্য অন্য ৮০ জন স্বাক্ষরকারীর সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে পারেন।
জিতেন নন্দী

৮ জানুয়ারি ২০১১, প্রতিক্রিয়া ১৩
আমি দুঃখিত যে আপনি বিবৃতির লেখকদের কাছ থেকে কোন সাড়া পাননি। এটা বুঝতে পারছি একটা কথাবার্তা চালাতে চাওয়া হচ্ছে, কিন্তু সেটা ওঁদের সঙ্গে হওয়া বাঞ্ছনীয়।
নোয়াম চমস্কি

রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের রায়

নির্দেশক অংশটি

সেকেন্ড অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট অ্যান্ড সেশন কোর্ট, রায়পুর (ছত্তিশগড়)
(বেঞ্চে বসে : বি পি ভার্মা)
সেশন ক্রমিক সংখ্যা : ১৮২/২০০৭
ছত্তিশগড় সরকার
আসামী
১) পীযূষ ওরফে বাবুন গুহ
পিতার নাম : সুনীল কুমার গুহ
পেশা : কেন্দু পাতা ব্যবসায়ী
বয়স ৪০ বছর,
বসত : সাগরপাড়া, থানা জলঙ্গী, জেলা মুর্শিদাবাদ
২) ডা. বিনায়ক সেন
পিতার নাম : ডা. ডি পি সেন
বয়স : ৬০ বছর,
পেশা : ডাক্তার
বসত : এ-২৬, সূর্য অ্যাপার্টমেন্ট, কাটোরা তালাব, রায়পুর (ছত্তিশগড়)
৩) নারায়ণ সান্যাল ওরফে নবীন ওরফে বিজয়
পিতার নাম : জে এন সান্যাল ওরফে টি এন সান্যাল
বয়স : ৭৪ বছর,
পেশা : কিচ্ছু না
বসত : পি-৭, সেনহাটি কলোনি, ডায়মন্ড হারবার রোড, কলকাতা ৩৪, থানা বেহালা

শ্রী টি এস পাণ্ডিয়া, বাদীপক্ষের বিশেষ পাবলিক প্রসিকিউটর
শ্রী এস কে ফারহান, আসামী পীযুষ গুহ-র উকিল
শ্রী সুরেন্দ্র সিংহ ও শ্রী মহেন্দ্র দুবে, আসামী ডা. বিনায়ক সেনের উকিল।
শ্রী হাসিম খান, আসামী নারায়ণ সান্যালের উকিল।

১২২. অভিযুক্ত পীযূষ গুহ, ডা. বিনায়ক সেন এবং নারায়ণ সান্যালকে শাস্তির বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। অভিযুক্ত নারায়ণ সান্যালের বিদ্বান আইনজীবী জানিয়েছেন, তাঁর শাস্তি নিয়ে কিছু বলার নেই। অভিযুক্ত পীযুষ গুহ এবং ডা. বিনায়ক সেনের বিদ্বান আইনজীবীরা বলেছেন, অভিযুক্ত পীযূষ গুহ যুবক, এবং অভিযুক্ত বিনায়ক সেন বয়স্ক। তাই তাদের ন্যূনতম শাস্তি দেওয়া হোক। বিশেষ পাবলিক প্রসিকিউটর দাবি করেছেন, সমস্ত অভিযুক্তদের সর্বোচ্চ শাস্তি দেওয়া উচিত।

১২৩. উভয় পক্ষের সওয়াল বিবেচনা করা হয়েছে। অভিযুক্তরা আইনসম্মতভাবে প্রতিষ্ঠিত ভারত সরকারের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের গুরুতর অপরাধ করেছেন, এবং অভিযুক্ত নারায়ণ সান্যাল একটি সন্ত্রাসবাদী সংগঠন কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া (মাওবাদী) দলের সক্রিয় সদস্য। এছাড়াও অভিযুক্তরা সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলোকে সহযোগিতা করেছেন। অভিযুক্তদের অপরাধ গুরুতর। বর্তমানে সন্ত্রাসবাদী এবং নকশাল সংগঠনগুলি যেভাবে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীকে, পুলিশ কর্তা/কর্মীদের, সরল আদিবাসীদের, এবং নিরীহ মানুষ মারছে তা বর্বরতা/নিষ্ঠুরতা। তারা ভয়, সন্ত্রাস, এবং অস্থিতি ছড়িয়ে দিয়েছে সারা দেশে, রাজ্যে এবং সমাজে। সেদিকে তাকিয়ে এই বিচারালয় মনে করে না অভিযুক্তদের 'অপরাধী ছাড় আইন'-এর সুবিধা দেওয়া যায় বা তাদের প্রতি দরদ দেখিয়ে ন্যূনতম সাজা দেওয়া যায়।

১২৪. এরপর আগে উল্লিখিত অপরাধের ভিত্তিতে নিচের সারণীতে অভিযুক্তদের শাস্তি বর্ণনা করা হল :

তিন অভিযুক্ত পীযূষ গুহ, নারায়ণ সান্যাল এবং ডা. বিনায়ক সেনের সাজা একইসাথে চলবে।

২৪ ডিসেম্বর ২০১০

অনুবাদক শমীক সরকার

কাকে কোন কোন ধারায় শাস্তি দেওয়া হল

ক্রমিক নং	কোন ধারায় শাস্তি	অভিযুক্ত পীযূষ গুহ	অভিযুক্ত নারায়ণ সান্যাল	অভিযুক্ত বিনায়ক সেন
১	ভারতীয় দণ্ডবিধি ১২৪ (এ) এবং ১২০ (বি)	যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং ৫০০০ টাকা আর্থিক সাজা, যার অনাদায়ে আরও একবছরের সশ্রম কারাদণ্ড।	যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং ৫০০০ টাকা আর্থিক সাজা, যার অনাদায়ে আরও একবছরের সশ্রম কারাদণ্ড।	যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং ৫০০০ টাকা আর্থিক সাজা, যার অনাদায়ে আরও একবছরের সশ্রম কারাদণ্ড।
২	ধারা ৮(১), ছত্তিশগড় বিশেষ জনসুরক্ষা আইন, ২০০৫	দু বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১০০০ টাকা আর্থিক সাজা, যার অনাদায়ে আরও তিনমাসের সশ্রম কারাদণ্ড।	দু বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১০০০ টাকা আর্থিক সাজা, যার অনাদায়ে আরও তিনমাসের সশ্রম কারাদণ্ড	দু বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১০০০ টাকা আর্থিক সাজা, যার অনাদায়ে আরও তিনমাসের সশ্রম কারাদণ্ড
৩	ধারা ৮(২), ছত্তিশগড় বিশেষ জনসুরক্ষা আইন, ২০০৫	এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১০০০ টাকা আর্থিক সাজা, যার অনাদায়ে আরও তিনমাসের সশ্রম কারাদণ্ড।	এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১০০০ টাকা আর্থিক সাজা, যার অনাদায়ে আরও তিনমাসের সশ্রম কারাদণ্ড।	এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১০০০ টাকা আর্থিক সাজা, যার অনাদায়ে আরও তিনমাসের সশ্রম কারাদণ্ড।
৪	ধারা ৮(৩), ছত্তিশগড় বিশেষ জনসুরক্ষা আইন, ২০০৫	তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১০০০ টাকা আর্থিক সাজা, যার অনাদায়ে আরও তিনমাসের সশ্রম কারাদণ্ড।	তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১০০০ টাকা আর্থিক সাজা, যার অনাদায়ে আরও তিনমাসের সশ্রম কারাদণ্ড।	তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১০০০ টাকা আর্থিক সাজা, যার অনাদায়ে আরো তিনমাসের সশ্রম কারাদণ্ড।
৫	ধারা ৮(৫), ছত্তিশগড় বিশেষ জনসুরক্ষা আইন, ২০০৫	পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১০০০ টাকা আর্থিক সাজা, যার অনাদায়ে আরো তিনমাসের সশ্রম কারাদণ্ড।	পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১০০০ টাকা আর্থিক সাজা, যার অনাদায়ে আরো তিনমাসের সশ্রম কারাদণ্ড।	পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১০০০ টাকা আর্থিক সাজা, যার অনাদায়ে আরো তিনমাসের সশ্রম কারাদণ্ড।
৬	ধারা ৩৯ (২), বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইন, ১৯৬৭	পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১০০০ টাকা আর্থিক সাজা, যার অনাদায়ে আরো তিনমাসের সশ্রম কারাদণ্ড।	পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১০০০ টাকা আর্থিক সাজা, যার অনাদায়ে আরো তিনমাসের সশ্রম কারাদণ্ড।	পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১০০০ টাকা আর্থিক সাজা, যার অনাদায়ে আরও তিনমাসের সশ্রম কারাদণ্ড।
৭	ধারা ২০, বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইন, ১৯৬৭	প্রযোজ্য নয় (অভিযুক্ত পীযূষ গুহ ধারা ২০, বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইন, ১৯৬৭ –তে দোষী নয়।)	দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ২০০০ টাকা আর্থিক সাজা, যার অনাদায়ে আরও ছয়মাসের সশ্রম কারাদণ্ড।	প্রযোজ্য নয় (অভিযুক্ত ডা. বিনায়ক সেন ধারা ২০, বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইন, ১৯৬৭ –তে দোষী নয়।)

মন্থন সাময়িকীর গ্রাহক হ'ন।

২০১১ সালের ৬টি সংখ্যার গ্রাহক–চাঁদা পঞ্চাশ টাকা।

ডাকযোগে পত্রিকা সংগ্রহ করার জন্য টাকা পাঠান এই ঠিকানায় :
জিতেন নন্দী, বি ২৩/২ রবীন্দ্রনগর, বড়তলা, কলকাতা ৭০০০১৮
দূরভাষ : ২৪৯১৩৬৬৬, ই–মেল : manthansamayiki@gmail.com

বিষয় : রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের রায়

ত্রুটিপূর্ণ সাক্ষ্য এবং সিদ্ধান্ত

মাদাভুষি শ্রীধর

মাদাভুষি শ্রীধর হায়দ্রাবাদের ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অফ লিগাল স্টাডিজ অ্যান্ড ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক। এই প্রবন্ধটি 'দ্য হিন্দু' পত্রিকায় প্রকাশিত এই প্রবন্ধটি এখানে বাংলায় তর্জমা করে প্রকাশ করা হল। অনুবাদক অমিতাভ সেন।

ডাঃ বিনায়ক সেনকে কিছু অভিযোগের সত্যতা যাচাই না করে এবং অযৌক্তিক ও অসাংবিধানিক কিছু তথ্যের ভিত্তিতে সাজা দেওয়া হয়েছে।

শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠান-বিরোধী রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা থাকার জন্য, বিনায়ক সেনের মতো মানবাধিকার কর্মীদের রাষ্ট্রদ্রোহী ও ষড়যন্ত্রমূলক কাজকর্মের অভিযোগে অভিযুক্ত করার সাংবিধানিক বৈধতা আছে কিনা, সেই প্রশ্ন তোলা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এই পদক্ষেপ মতপ্রকাশের সাংবিধানিক স্বীকৃতিকে হাস্যকর করে তুলেছে।

ভারতীয় দণ্ডবিধির যে অনুচ্ছেদে 'সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-প্রচেষ্টার ষড়যন্ত্র' (১২১এ) এবং 'রাষ্ট্রদ্রোহ' (১২৪এ) নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, সেই অংশগুলি তাদের সংজ্ঞা ও পরিধিতে ভয়ানক নির্মম এবং তাতে বিপুল পরিমাণ যে শাস্তির নির্দেশ আছে, তা অসঙ্গতিপূর্ণ। ১৮৬০ সালে প্রথম যে ভারতীয় দণ্ডবিধি তৈরি হয় তাতে ১২১এ ধারাটি ছিল না। ১৮৭০ সালের এক সংশোধনীতে একে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। স্বাধীনতার পর ১৯৫১ সালে আবার এর সংশোধন হয়। সেখানে শুধুমাত্র 'ব্রিটিশ ভারত'-এর পরিবর্তে 'রাষ্ট্র' শব্দটি বসানো হয়। তৎকালীন ভারত সরকার ও দেশীয় রাজ্যগুলির শাসকদের বিরুদ্ধে লড়াই করছিল, তাদের শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে ১৯৩৭ সালে ব্রিটিশরা একটা অর্ডিনান্স জারি করে। তাতে এই ভারতীয় দণ্ডবিধিটি সংশোধন করে 'স্থানীয় সরকার'-এর সংজ্ঞাটিতে একটা সংযোজন করা হয়। সেখানে যে কোন সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জন্য শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা বাড়িয়ে দেওয়া হয়। স্বাধীনতার প্রবক্তা যে কোন জাতীয়তাবাদী নেতাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য ১২৪এ ধারাটি ব্যবহার করা হত।

সোভিয়েত রাশিয়ায় যেভাবে ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তোলা হত, সেভাবে ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তোলার জন্য অভিযুক্তকে যুদ্ধ জারি করার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তোলা হয়েছিল মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায়। একটি সেশন কোর্ট অভিযুক্তদের দোষী হিসেবে চিহ্নিত করে এবং এলাহাবাদ হাইকোর্ট রায় দেয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না অপরাধী শক্তির মদতে বা সেই শক্তির ভয় দেখিয়ে কোন সরকারকে বাগে আনার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে, ততক্ষণ এধরনের তথ্যপ্রমাণ হাজির করা ঠিক নয়।

১২৪এ ধারায় 'রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে উস্কানি দেওয়া'-কে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল, পরে ১৮৯৮ সালে 'রাষ্ট্রদ্রোহ' শব্দটি দিয়ে তা প্রতিস্থাপিত হয়। ইংরেজ আইন অনুসারে 'রাষ্ট্রদ্রোহ' কথাটার আসল মানে হল সরকারের কুৎসা করে কিছু লেখা। কিন্তু সাধারণভাবে এর ইংরেজি মানে হল 'সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ গড়ে তোলা' (কেদারনাথ বনাম বিহার রাজ্য, এআইআর ১৯৬২ এসসি ৯৫৫)। অথচ নীহারেন্দু মজুমদারের মামলায় (এআইআর ১৯৪২ এফসি ২২ (২৬)) ফেডারেল কোর্ট 'রাষ্ট্রদ্রোহ'-র একটা উদার সংজ্ঞা দেয় : 'যে কাজ বা কথা বলাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে, সেগুলি হয় অবশ্যই বিশৃঙ্খলাকে মদত দেওয়া হতে হবে, নয়তো তা এমন হতে হবে যাতে তাদের উদ্দেশ্য বা ঝোঁক সম্পর্কে যুক্তিপূর্ণ মানুষের সন্দেহ থাকবে না। কিন্তু বাল গঙ্গাধর তিলকের মামলায় (আইএলআআর (১৮৯৮) ২২, বোম ১১২) আদালত রায় দেয়, যদি কোন ব্যক্তি সরকার বিরোধী মনোভাবকে উস্কানি দেয় বা তার চেষ্টা করে, তা সে বড়ো আকারেই হোক বা ছোটো আকারেই হোক, সে এই ধারা বলে দোষী সাব্যস্ত হবে। এই মতটা পরে প্রিভি কাউন্সিল সঠিক বলে প্রতিষ্ঠা করে।

স্বাধীনতার পরে, সুপ্রিম কোর্টে এই বিতর্ক ওঠে, ১২৪এ ধারাটি সংবিধান-বহির্ভুত, কারণ এটা সরকারের বিরুদ্ধে কোনরকম খারাপ কিছু মনে হলেই শাস্তি দিতে চাইছে এবং এটা একটা অযৌক্তিক নিষেধাজ্ঞা।

১৯৫১ সালে সংবিধানের প্রথম সংশোধনীতে ১৯ (২) ধারায় যে 'পাবলিক অর্ডার' অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তার ভিত্তিতেই রাষ্ট্র যুক্তিপূর্ণ নিষেধাজ্ঞা আইন জারি করতে পারে। ফলে কেদারনাথের মামলায় সুপ্রিম কোর্টের দ্বারা 'রাষ্ট্রদ্রোহ' বিষয়ক বিচারটি সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু সংবিধান-প্রণেতারা কখনও নির্দিষ্ট করে বলেননি যে 'রাষ্ট্রদ্রোহ'-এর ভিত্তিতে বাক-স্বাধীনতার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা উচিত। মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর লাগাম টানার জন্য যদি 'পাবলিক অর্ডার'-এর ভিত্তি বর্ধিত করা হয়, তবুও 'পাবলিক অর্ডার'-এর ব্যাপ্ত প্রকাশের মধ্যে রাষ্ট্রদ্রোহ আসে না।

অতএব 'রাষ্ট্রদ্রোহ গড়ে তোলার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত' বলে বিনায়ক সেনকে শাস্তি দেওয়া অযৌক্তিক, অন্যায্য এবং একই সঙ্গে অসাংবিধানিকও বটে। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কেবল মন্তব্য করা রাষ্ট্রদ্রোহ নয়, যতক্ষণ না তার সঙ্গে হিংস্রতা বা বিশৃঙ্খলাকে উদ্দীপ্ত করা যুক্ত হচ্ছে। যখন এটা আদৌ রাষ্ট্রদ্রোহ নয়, তখন 'রাষ্ট্রদ্রোহের ষড়যন্ত্র'-র অভিযোগের ভিত্তি কোথায়? ডাঃ সেন, এমনকী, রাষ্ট্রদ্রোহ শব্দটির সংজ্ঞাও জানতেন না। তিনি এর মানে জিজ্ঞেস করেছিলেন এবং বিচারক তার উত্তরে বলেছিলেন 'রাজদ্রোহ'।

পাঞ্জাবের শিক্ষা বিভাগের দুজন অফিসার যখন শ্লোগান দিয়েছিলেন, 'খালিস্তান জিন্দাবাদ, রাজ করেগা খালসা', তাঁদের বিরুদ্ধে 'রাষ্ট্রদ্রোহ'-এর অভিযোগ আনা হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্ট তা খারিজ করে দেয় (১৯৫৩ (৩) এসসিসি ২১৪) এই কথা বলে, এর ফলে জাতীয় ঐক্য ও সংহতির কোন ক্ষতি হয়েছে কিনা তা আদালতের দেখা উচিত। তখন এটাও বলা হয়েছিল, মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে ১২৪এ ধারাটি ব্যবহার করা উচিত নয়। স্বাধীন বক্তব্যকে তখনই যুক্তিসম্মতভাবে নিষেধ করা যায়, যখন তা হিংস্রতা ও জনগণের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। ওই ধরনের ঘটনা ওই বক্তব্যের ফলে ঘটেছে কিনা তা প্রমাণ করার পরই কোন ব্যক্তিকে 'রাষ্ট্রদ্রোহ'-এ অভিযুক্ত করা যায়। কেদারনাথ বনাম বিহার রাজ্যের মামলায় সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের ব্যাখ্যা যদি আমরা গ্রহণ করি, তাহলে ডাঃ বিনায়ক সেন পত্রবাহকের কাজ করেছেন — এটা প্রমাণিত হলেও, তাঁকে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না।

কারণ এটা প্রমাণ করা যায়নি যে এর ফলে জনসাধারণের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে।

যথেষ্ট সন্দেহ থাকলেও, আদালতে যে মামলা রুজু করা হয়েছে তাতে অপরাধ প্রমাণ করতেই হবে। এমনকী একটিমাত্র যৌক্তিক সন্দেহও অপ্রমাণিত থাকলে অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না। তার মানে মোকদ্দমাটি তার প্রমাণিতব্য সমস্ত কিছুকে তার ঘাড় থেকে নামাতে পারেনি। রায়পুরের অ্যাডিশনাল সেশন জজের করণীয় ছিল, অভিযোগকারীরা যে সমস্ত সন্দেহের যুক্তি হাজির করেছে তার সবগুলির ব্যাখ্যা করা, যাতে অপরাধ প্রমাণিত হয়। কিন্তু তিনি তা করেননি।

১২৪এ ধারা মোতাবেক ডাঃ সেনকে রাষ্ট্রদ্রোহে অভিযুক্ত করা অবাঞ্ছিত এবং তাঁকে এই অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না, এমনকী যদি মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে আনা প্রমাণগুলির সবক'টিও আদালতে গ্রাহ্য হয়। ভারতীয় দণ্ডবিধিতে এই অপরাধের শাস্তি সম্পর্কে যা লেখা আছে, তার সঙ্গে এই ধারা সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্টের যে ব্যাখ্যা রয়েছে, তাকেও আইন হিসেবে গ্রাহ্য করা উচিত।

যখন তদন্তকারী পুলিশ অফিসাররাই এই মামলার প্রধান সাক্ষী, তখন তাঁদের সাক্ষ্য সত্য বলে দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হওয়ার অপেক্ষা রাখে। কারণ তাঁরা নিরপেক্ষ সাক্ষী নন। কেবলমাত্র তাঁদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে দোষী বলে শাস্তি প্রদান অযৌক্তিক ও অন্যায্য। বিচারের রায়কে যেন অন্ততপক্ষে দেখে মনে হয়, এটা একটা স্বতন্ত্র মতামত এবং তা অবশ্যই উপস্থিত সাক্ষ্যপ্রমাণের দ্বারা বিশ্বাসযোগ্যভাবে সমর্থিত হতে হবে। এই মামলার সঙ্গে কমপক্ষে ছ'টা খারাপ সাক্ষ্য, যৌক্তিক সন্দেহ এবং অযৌক্তিক বিরোধের বিষয় জড়িয়ে আছে।

১। অভিযোগ, ডাঃ সেন নারায়ণ সান্যাল মহাশয়ের চিঠি জেলের বাইরে অন্য নেতাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন। এটা যথেষ্ট যুক্তিগ্রাহ্যভাবে বিশ্বাস করা যায় যে একজন মাওবাদী নেতার হাত থেকে পিইউসিএল-এর পদাধিকারী ডাঃ সেনের হাতে চিঠি চালান হয়ে যাওয়ার সুযোগ যাতে কোনভাবেই না থাকে তার জন্য যথেষ্ট কড়া নজরদারির ব্যবস্থা থাকার কথা। কিন্তু বিচারক এই চিঠির বিষয়টাকেই ডাঃ সেনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে প্রধান প্রমাণ হিসেবে দেখেছেন। এই ধরনের পত্রবহনের অভিযোগে আরও তিনজন অভিযুক্তকে যখন 'যুদ্ধ ঘোষণার চক্রান্ত'-এর অভিযোগে অপরাধী করা হয়নি, তখন ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪এ ধারার সঙ্গে ১২০বি ধারা যুক্ত করে ডাঃ সেনের বিরুদ্ধে ওই একই চিঠি 'যুদ্ধ ঘোষণার চক্রান্ত'-এর অভিযোগের সাক্ষ্যপ্রমাণ হয়ে উঠতে পারে?

২। যথেষ্ট সন্দেহের প্রমাণ হিসেবে প্রথমত যে তথ্য দাখিল করা হয়েছে, তা হল কম্পিউটারে ছাপানো একটা চিঠি (লেখা আছে ৩৭নং দফা), যা নাকি মাওবাদীরা পাঠিয়েছে ডাঃ সেনের উদ্দেশ্যে — এরও কোন ব্যাখ্যা নেই। এই চিঠিতে কারও স্বাক্ষর নেই, এটা যাঁরা বাজেয়াপ্ত করেছেন তাঁদেরই দুজনের স্বাক্ষর রয়েছে এই চিঠির ওপর। কাজেই যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে যে এই চিঠি ডাঃ সেনের ঘর থেকে বাজেয়াপ্ত করা না তা বানানো। যে সমস্ত দলিলপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, তার প্রত্যয়িত তালিকাতেও এই চিঠির কোনও উল্লেখ নেই। এমনকী বাজেয়াপ্ত করা জিনিসের যে রশিদ দেওয়া হয়েছে, তাতেও এর উল্লেখ নেই।

৩। পুলিশ ও জেলের অফিসারদের কড়া প্রহরার মধ্যেই ডাঃ সেনের হাতে চিঠি চালান যাওয়ার সুযোগ কী করে হয়, তা নিয়ে যখন সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে এবং সরাসরি বা ঘুরিয়ে এই ঘটনার প্রমাণে যখন অন্য কোন সাক্ষ্য নেই, তখন শ্রী পীযূষ গুহের কাছে পাওয়া এই চিঠির ভিত্তিতে শ্রী গুহকে দোষী প্রমাণ করা যায়? এই যে এক হাত থেকে অন্য হাতে চিঠি চলে যাওয়া, এর কোন ব্যাখ্যা এই মামলায় নেই। দুজন জেলার জানিয়েছিলেন, জেলের ভিতর ডাঃ সেনের হাতে শ্রী সান্যালের পক্ষে কিছু পাচার করা সম্ভব নয়। কিন্তু বিচারক তা গ্রাহ্য করেননি। ডাঃ সেন শ্রী সান্যালের আত্মীয় হিসেবেই এই কাজে সহায়তা করেছেন — একথা বলেছেন জেল-কর্মচারী সদস্যদের প্রধান-পরীক্ষক এবং বিচারক তা বিশ্বাস করেছেন। পাল্টা সওয়াল-জবাবে তাঁরা স্বীকার করেছেন যে ডাঃ সেন পিইউসিএলের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে এবং পিইউসিএলের লেটারহেডে লেখা চিঠি নিয়ে শ্রী সান্যালের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। ওই চিঠি আদালতে নথিভুক্ত করা আছে।

৪। ডাঃ সেনের বাড়ি থেকে বাজেয়াপ্ত করা জিনিসপত্র পুলিশ একটা সিল-না-করা খোলা ব্যাগে নিয়ে গিয়েছিল। এই ত্রুটি এই সন্দেহের উদ্রেক করে যে পরে অন্য কোন চিঠিকে ওই ব্যাগের মধ্যে ঢোকানোর সুযোগ রয়ে গিয়েছিল। ব্যাগটাকে যে সিল করা হয়নি তা একটা ভিডিও ছবিতে তোলা হয়েছিল। কিন্তু আদালত তা মানতে চায়নি।

৫। বিচারপতি ভার্মা পাল্টা সওয়াল-জবাবকে কোন গুরুত্ব দেননি। তিনি শুধুমাত্র সরকারি উকিলের প্রধান-পরীক্ষকের ওপর ভরসা করেছেন। যদি পাল্টা সওয়াল-জবাবের সাক্ষ্য সরকার পক্ষের প্রধান বক্তব্যের বিরোধী হয়, তাহলে প্রমাণের কোন মূল্য থাকে না।

৬। ডাঃ সেনের সঙ্গে শ্রী গুহের যে কখনও সাক্ষাৎ হয়েছিল, তা ছত্তিশগড় পুলিশ প্রমাণ করতে পারেনি। একজন হোটেল-মালিক ও এক হোটেল-ম্যানেজার আদালতকে জানিয়েছে যে তাঁরা তাঁদের হোটেলে শ্রী গুহের সঙ্গে ডাঃ সেনকে কখনও সাক্ষাৎ করতে দেখেননি। কিন্তু রায়ে এর কোন উল্লেখ নেই। এর পরিবর্তে জনৈক অনিল সিংয়ের সাক্ষ্য বিশ্বাস করা হয়েছে : তিনি নাকি শ্রী গুহকে গ্রেপ্তার করার সময় ওখান দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং তিনি শুনে ফেলেছেন যে শ্রী গুহ পুলিশকে বলছেন যে ওই চিঠিগুলি তাঁকে ডাঃ সেন দিয়েছিলেন। শ্রী গুহকে গ্রেপ্তার করার সময় 'পঞ্চনামা' বা তার সঙ্গে যা পাওয়া গেছে তার তালিকায় ওই চিঠিগুলির কোন উল্লেখ নেই। বিচারক উল্লেখ করেছেন যে শ্রী গুহ পশ্চিমবঙ্গে একটি নকশালবাদী মামলার আসামী।

খবরের কাগজ সংবাদমন্থন

চলতে ফিরতে আপনার রোজকার জীবনের সরাসরি উপলব্ধি, অভিজ্ঞতার খবর পাঠান।

খবর দিন খবর নিন

যোগাযোগ

জিতেন নন্দী, বি ২৩/২ রবীন্দ্রনগর, বড়তলা, কলকাতা ৭০০০১৮, দূরভাষ : ২৪৯১৩৬৬৬, ই-মেল : manthansamayiki@gmail.com

ছত্তিশগড়ের রায়পুর থেকে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পাওয়া বিনায়ক সেনের আদালতে পেশ করা শেষ বয়ান

আমি একজন ডাক্তার, শিশুস্বাস্থ্যে আমার বিশেষজ্ঞতা। ভেলোরের ক্রিশ্চিয়ান মেডিকাল কলেজ (সিএমসি) থেকে ১৯৭২ সালে এমবিবিএস এবং ১৯৭৬ সালে এমডি ডিগ্রি পাই। তারপর আমি দিল্লির জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ে সেন্টার ফর সোস্যাল মেডিসিন অ্যান্ড কমিউনিটি হেলথে দু'বছর কাজ করি, তারপর মধ্যপ্রদেশের হোসাঙ্গাবাদের রসুলিয়াতে ফ্রেন্ডস রুরাল সেন্টারে হাতেকলমে স্বাস্থ্যপ্রকল্পে অংশ নিতে যাই। আমি সেখানে দু'বছর কাজ করি। সেখানে টিবি রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসার কাজ করি খুব নিবিড়ভাবে। সেই কাজ করতে গিয়ে এই রোগের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কারণগুলি সম্পর্কে জানতে পারি। সেই সময় রসুলিয়া সেন্টারে থাকতেন মহাত্মা গান্ধীর জীবনীকার মারজোরি সাইকস, আমি তাঁর কাজেও খুব প্রভাবিত হয়েছিলাম।

১৯৮১ সালে আমি ছত্রিশগড়ে আসি। সেখানে দুর্গ জেলার দল্লি রাজহারা অঞ্চলে প্রয়াত শঙ্কর গুহ নিয়োগী এবং ছত্তিশগড় মাইন শ্রমিক সঙ্ঘের সঙ্গে কাজ করি ১৯৮৭ পর্যন্ত। সেখানে শহীদ হাসপাতাল তৈরিতে আমার সহযোগিতা ছিল, যা আজও ওই অঞ্চলের আদিবাসী এবং শ্রমিকদের কম দামে যুক্তিগ্রাহ্য ওষুধ সরবরাহ করে থাকে। দল্লি রাজহারা ছাড়ার পর আমি অধুনা ধামতারা জেলায় বাগরুমনালা গ্রাম ও তার আশেপাশে আদিবাসীদের মধ্যে একটি স্বাস্থ্যপ্রকল্প গড়ে তোলার কাজ করি। এই কাজ হয়েছিল একদল গ্রাম্য স্বাস্থ্যকর্মীর ওপর ভরসা করে, যাদের আমি প্রশিক্ষণ দিয়েছিলাম। নয়া ছত্তিশগড় রাজ্য যখন তৈরি হল, স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রের সংস্কারে আমি পরামর্শদাতা মনোনীত হয়েছিলাম। তখনই আমি 'মিটানিন' প্রকল্প তৈরিতে সাহায্য করি, যা পরে জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশনের 'আশা' প্রকল্পের রোলমডেল হয়েছিল। ...

কমিউনিটি স্বাস্থ্য এবং মানবাধিকারের বিষয়ে আমার কাজ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে স্বীকৃত। ২০০৪ সালে আমি ভেলোরের সিএমসি থেকে পল হ্যারিসন পুরস্কার পাই। ইন্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অব সোস্যাল সায়েন্স থেকে আমি আর আর কেইথান গোল্ড মেডেল পাই ২০০৭ সালে। ২০০৮ সালে গ্লোবাল হেলথ কাউন্সিল থেকে স্বাস্থ্য ও মানবাধিকারের জন্য জোনাথন মান পুরস্কার পাই। আমি ১৯৮১ সাল থেকেই পিপলস ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টিজ (পিইউসিএল)–এর সদস্য। এই পিইউসিএল জরুরি অবস্থার সময় জয়প্রকাশ নারায়ণের গড়ে তোলা সাংবিধানিক নাগরিক স্বাধীনতা এবং মানবাধিকারের একটি সংগঠন। পিইউসিএল ছত্তিশগড় সহ সারা দেশে বাক স্বাধীনতা, পুলিশি হেফাজতে অত্যাচার এবং মানুষের প্রতি পুলিশের দায়বদ্ধতা রক্ষার আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়। ২০০৪ সালে আমি পিইউসিএলের ছত্তিশগড় শাখার সম্পাদক হই। এখন আমি এই সংগঠনের রাজ্য সভাপতি এবং জাতীয় স্তরে সহ সভাপতি।

ছত্তিশগড়ে পিইউসিএল পুলিশি অত্যাচারের নাকাব খুলে দেওয়ার লড়াইয়ে অগ্রণী। উর্দিধারীদের অসহায় মানুষের ওপর অত্যাচার এই রাজ্যে একটি চালু সমস্যা, ১২ সেপ্টেম্বর ২০১০–এর সানডে টাইমসের প্রথম পাতার খবরে এর উল্লেখ আছে। এই পরিস্থিতিতে সাংবিধানিক মূল্যবোধ এবং সুশাসনে পিইউসিএলের প্রয়াস সর্বদা জারি রয়েছে। পিইউসিএল তার অনুসন্ধানের বিবরণ নিজস্ব প্রকাশন এবং প্রেস রিলিজের মাধ্যমে সবসময় লোককে জানায়। কইলিবেদা থানার অন্তর্গত জিরামতারাই গ্রামে পুলিশি অত্যাচারের এরকমই এক অনুসন্ধান প্রতিবেদন একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছিল। কাটগাঁও–এ আরেকটি পুলিশি নিপীড়নের অনুসন্ধান প্রতিবেদন 'নবভারত' এবং 'দেশবন্ধু' নামের দুটি খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল। পিইউসিএলের আরেকটি প্রকাশন ছত্তিশগড়ের মানবাধিকারের অবস্থা সকলের নজরে আনে। এই কারণে পিইউসিএল সবসময় জাতীয় এবং রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের সঙ্গে সংযোগ রেখে চলে।

পুলিশের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা অনুসন্ধান এবং নথিভুক্তি ছাড়াও পিইউসিএল সালওয়া জুডুমের আসল চরিত্র ফাঁস করে দেওয়ার কাজও করেছে। সালওয়া জুডুম তৈরি হয় দান্তেওয়াড়াতে, ২০০৫ সালে। রাজ্য সরকার একে বলেছিল মাওবাদীদের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা স্বতঃস্ফূর্ত জন আন্দোলন। কিন্তু পিইউসিএল এবং অন্যান্য মানবাধিকার সংগঠনগুলির অনুসন্ধানে প্রকাশ পায়, এটি বাস্তবে রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায়, রাষ্ট্রের টাকায় চলা সম্পূর্ণ দায়হীন একটি ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী। এদের সরকার অস্ত্রশস্ত্র দেয়। সালওয়া জুডুমের কার্যকলাপে ৬০০ গ্রাম জনশূন্য হয়েছে, ৬০,০০০ মানুষ ঘর ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। সালওয়া জুডুমের কার্যকলাপে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে অনেক স্বাধীন সংস্থা, যার মধ্যে রয়েছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। ইউনিসেফের মতো আন্তর্জাতিক সংগঠনও উদ্বিগ্ন হয়েছে এবং আমাকে ডেকে পাঠিয়ে কথাবার্তা বলতে চেয়েছে, কীভাবে সালওয়া জুডুম দ্বারা আক্রান্ত গ্রামগুলিতে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে নিয়ে আসা যায়। মহামান্য সুপ্রিম কোর্টও বারবার সালওয়া জুডুম এবং রাষ্ট্রীয় নীতির প্রসারের কাজে ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী প্রেরণে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। সংবাদপত্রে এই নিয়ে বিস্তর প্রতিবেদন হয়েছে। ...

২০০৬ সালে পিইউসিএল ছত্তিশগড় স্পেশ্যাল পাবলিক সিকিউরিটি অ্যাক্ট লাগু করার বিরুদ্ধে দুটি বড়ো কনভেনশন করে। কারণ আমাদের মতে এই আইন সাংবিধানিক নাগরিক স্বাধীনতার বিরুদ্ধে। আমি সংবাদমাধ্যমেও এসব কথা বলেছি। এই আইনের বিরুদ্ধে পিইউসিএল ছত্তিশগড় উচ্চ আদালতে (রিট পিটিশন নং ২১৬৩/২০০৯) একটি নাগরিক রিট পিটিশন দাখিল করে।

এসব কারণে ছত্তিশগড় পুলিশ এবং রাজ্য সরকার আমার বিরুদ্ধে খেপে যায় এবং তদানীন্তন ডিজিপি ও পি রাঠোর প্রকাশ্যে পিইউসিএল এবং তার পদাধিকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি দেন। ২০০৬ সালের ৩ জানুয়ারি এটা খবরের কাগজে বেরিয়েছিল। আমি মানবাধিকার কর্মী হিসেবে জেলে বন্দীদের ব্যাপারে খেয়াল রাখি এবং সে কারণেই নারায়ণ সান্যালের পরিবার তাঁর স্বাস্থ্য এবং ভালোমন্দ দেখভালের জন্য আমাকে অনুরোধ করেন, যখন তাঁকে ২০০৬ সালে রায়পুর জেলে আনা হয়। আমি রায়পুর জেলে প্রথমবার তাঁকে দেখতে যাই তাঁর পরিবার এবং আইনজীবীর সাথে। পরে আমি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তাঁর সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পাই এবং বেশ কয়েকবার দেখা করি। প্রতিবারই আমি তাঁর সাথে দেখা করেছি পিইউসিএলের পদাধিকারী হিসেবে। সাক্ষাতের পরই আমি তাঁর পরিবারকে তাঁর অবস্থা সম্পর্কে ফোনে জানাতাম। এইসময়েই আমি তাঁর ডানহাতে একটি অস্ত্রোপচার হওয়ার কথা জানতে পারি, কিন্তু তা দেরি হচ্ছিল জেল কর্তৃপক্ষ এবং রায়পুর মেডিক্যাল কলেজের মধ্যে যোগাযোগের সমস্যার কারণে। আমি তাঁর অস্ত্রোপচার যাতে হয়, তাতে সহায়তা করি এবং তাঁর পরিবারকে সে সম্পর্কে জানাতে থাকি। এই

সময়ে ঐ বন্দীর পরিবার, জেল কর্তৃপক্ষ এবং মেডিক্যাল কর্তৃপক্ষের মধ্যে প্রচুর চিঠি চালাচালি হয়। আমাকে উদ্দেশ্য করে এগুলোর কপি থাকত।

এই একই উদ্বেগ থেকে রায়পুর কেন্দ্রীয় জেলের অবস্থা সংক্রান্ত জনৈক মদনলাল বারখাড়ের চিঠি ডাকে পেয়ে আমি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলাম। এই চিঠিটি আমি সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছিলাম। ১৯ মে ২০০৭ আমার ঘর তল্লাশি করে যে নথি পাওয়া যায় তা আমার সাধারণ এবং স্বচ্ছ কার্যকলাপের নথি। সারা ভারতের মানবাধিকার সংগঠনগুলি আমাকে বই, পুস্তিকা ও নথি পাঠায়। এরকম হাজার হাজার জিনিস আমার ঘরে পড়ে থাকে, কারণ আমার ঘরই আমার অফিস। এগুলির কোনটাই গোপনভাবে বা বিপ্লবী কায়দায় জোগাড় করা নয়। নথি নং এ ১৯ আমাকে পাঠিয়েছিলেন গোবিন্দন কুট্টী, পিপলস মার্চের সম্পাদক। নথি নং এ ২০ জনৈক মদনলাল বারখাড়ের লেখা বলে মনে হয়, এসেছিল সাধারণ ডাকে। নথি নং এ ২১ আমাকে ই-মেল করে পাঠিয়েছিলেন নথির এক লেখিকা কল্পনা কান্নাবিরন, তখন তিনি হায়দ্রাবাদের ন্যাশনাল ল স্কুলের অধ্যাপিকা। নথি নং এ ২২ একটি হাতে লেখা নথির ফটোকপি, নথি নং এ ২৩ এবং এ ৩৬ সালওয়া জুডুম নিয়ে দিল্লির জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়ার নেলসন ম্যাণ্ডেলা সেন্টার ফর পিস অ্যান্ড কনফ্লিক্ট রেজোলিউশনের সংগঠিত একটি সেমিনারে বিতরিত হচ্ছিল, ২০০৭ সালে, সেখান থেকে পাওয়া। সেখানে আমি আমন্ত্রিত ছিলাম। নথি নং এ ২৪ আমি ডাকে পেয়েছি। নথি নং এ ২৫ থেকে এ ৩৫ সংবাদপত্রের কাটিং, আমি ওগুলো রেখেছিলাম ছত্তিশগড়ের আসন্ন পরিস্থিতি সম্পর্কে আমার আগ্রহের কারণে।

আমার বাড়ি তল্লাশিতে অনেক পুলিশ এসেছিল। কোনও নথি পেলেই তাদের শ্রীযুক্ত রাজপুত-কে দেওয়ার কথা। রাজপুত প্রথমে সেটা পড়বেন এবং তারপর আমার সই নেওয়ার জন্য সেটা আমার হাতে দেবেন। তারপর তিনি নিজে সই করবেন সেখানে। আমাদের দুজনের সই হয়ে গেলে তিনি টি আই জাগৃৎকে মুখে বলে দেবেন হেফাজত সনদে (সিজার মেমো) কী লেখা হবে। তারপর জাগৃৎ তা লিখবেন এবং রাজপুত জিনিসটি জাগৃৎ-এর হাতে তুলে দেবেন, এভাবেই প্রতিটা নথি হেফাজতে নেওয়া হয়, সই হয় এবং হেফাজত সনদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কোনও নথিতে কোনও প্রত্যক্ষদর্শী আমার উপস্থিতিতে সই করেনি। নথিগুলি আমার উপস্থিতিতে সিলও করা হয়নি। তল্লাশির পর এই নথিগুলিকে সিল না করেই একটি সাধারণ ব্যাগে নিয়ে যাওয়া হয়। নথি নং এ ৩৭ আমাকে কখনও সই করার জন্য দেওয়া হয়নি। এটা আমার অফিসে ছিল না এবং তা তল্লাশির সময় পাওয়া নথিও নয়। তল্লাশির পর পুলিশ এই নথিটা বানিয়েছে আমাকে ফাঁসানোর জন্য। আমার কেসের চালান যখন তৈরি হয়, আমার উকিল অমিত ব্যানার্জি কোর্টে উপস্থিত থেকে আমার পক্ষ থেকে চার্জশীট নেন।

চার্জশীটে আমরা দেখি, নথি নং এ ১৯ থেকে এ ২৪ পর্যন্ত প্রত্যক্ষদর্শীর কোনও সই-টই নেই। ওই সময় ২৫ থেকে ৩৭ নং নথি আমাদের দেওয়া হয়নি। কোর্টের নিষেধ থাকা সত্ত্বেও আমার কম্পিউটারের জিনিস ডিভিডি-তে কপি করা হয়েছে আমার উকিলের অনুপস্থিতিতে এবং তার মধ্যে থেকে কিছু বাছা বাছা ডিভিডি বিচারের সময় কোর্টে পেশ করা হয়েছে। যেসব ডিভিডি পেশ করা হয়েছে, তার মধ্যে তিনটি গোলাপল্লী, জিরামতারাই এবং কাটগাঁও-এ পুলিশি অত্যাচার / ভুয়ো সংঘর্ষের অনুসন্ধান সম্পর্কিত। এই টেপগুলিতে আমার সাথে ওখানকার গ্রামের আক্রান্ত মানুষদের কথোপকথন আছে। আমি দীপক চৌবে-কে (বন্দী নং ৭) এই কোর্টে হাজির করার আগে পর্যন্ত দেখিইনি। আমি তাঁকে নারায়ণ সান্যালের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিইনি এবং নারায়ণ সান্যালকে তাঁর বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার হয়েছিল, তাঁর এই গল্পকথা অসত্য। আসলে নারায়ণ সান্যাল গ্রেপ্তার হয়েছিলেন ভদ্রচলম থেকে।

আমি মনে করি আমার শাস্তি আইনানুগ নয়। আদতে এটা একটা অবিচার। আমাকে একটা দৃষ্টান্ত হিসেবে খাড়া করল ছত্তিশগড় রাজ্য সরকার, যাতে আর কেউ রাজ্যের মানবাধিকারের ভয়াবহ অবস্থা ফাঁস না করে দেয়। পুলিশ নথি জাল করেছে এবং আমাকে ফাঁসানোর জন্য ভুয়ো প্রত্যক্ষদর্শী হাজির করেছে।

অনুবাদক শমিক সরকার

কান্ডাল্লা বালাগোপাল স্মরণে

কিরীটি রায়

কান্ডাল্লা বালাগোপাল আজকের ভারতের মানবাধিকার আন্দোলনের এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। ভারতে নাগরিক অধিকারের যে লড়াই ১৯৮০ দশক থেকে বিশেষ ব্যপ্তি লাভ করেছিল, তার পুরোধা ছিলেন বালাগোপাল। জীবনের শেষ পর্যায় অবধি এই অধিকার অর্জনের লড়াইকে তিনি অব্যাহত রেখেছিলেন।

আমি বালাগোপালকে ব্যক্তিগত ভাবে চিনতাম বহু বছর আগে থেকে, নাগরিক অধিকারের লড়াইএর ময়দানে আমাদের বারবার দেখা হয়েছে, কখনও দিল্লি, কখনও মুম্বাই, কখনও কলকাতা বা হায়দ্রাবাদে আমরা একসাথে বহু সভা, সেমিনারে বক্তব্য রেখেছি। মুগ্ধভাবে শুনেছি তাঁর যুক্তি বিন্যাস, নানাভাবে নানাসময়ে আমাদের মধ্যে মত বিনিময় হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মানবাধিকার আন্দোলনের ক্ষেত্রে আমাদের যে যাত্রা তাঁর সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় বালাগোপালের সঙ্গে আমার একটা মিল ছিল। তিনি প্রথমে যুক্ত ছিলেন এ.পি.সি.এল.সি.-র সঙ্গে, যার সঙ্গে তাঁর নাম ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত ছিল। আমার প্রাক্তন সংগঠন এ.পি.ডি.আর.। নানা ঘটনা চক্রে যেমন আমিও এ.পি.ডি.আর. ছাড়তে বাধ্য হই, তেমনই বালাগোপাল এ.পি.সি.এল.সি. ছাড়তে বাধ্য হন। দুটি ঘটনা ঘটে একই সময়ে ১৯৯৭ সালে, বালাগোপাল তার সাথীদের নিয়ে মিলিত ভাবে তৈরি করলেন হিউম্যান রাইটস ফোরাম (মানবাধিকার মঞ্চ), আমরা তৈরি করলাম মানবাধিকার সুরক্ষা মঞ্চ। এই দুই সংগঠনই স্ব-স্ব এলাকায় পুরনো সংগঠনের বন্ধুদের দ্বারা সৃষ্ট ও পুষ্ট হয়েছে। এর পশ্চাতে যে গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল তা হল, ১। নাগরিক অধিকারের আন্দোলনকে মানবাধিকার আন্দোলনে উন্নীত করা; ২। মানবাধিকার আন্দোলনের মধ্যে বিভিন্ন চিন্তার প্রবেশ ঘটানো; ৩। রাষ্ট্রীয় হিংসার বিরোধিতা করার সাথে সাথে সশস্ত্র বিরোধী গোষ্ঠীদের গুরুতর ও সাঙ্ঘাতিক হিংসার বিরোধিতা করা।

ছাত্রজীবনে তিনি মেধাবী ছিলেন। গণিত শাস্ত্রে তিনি পি.এইচ.ডি করেন। পেশাগত জীবন শুরু করেছিলেন কাকতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা দিয়ে। কিন্তু অচিরেই তাঁর বিজ্ঞানসম্মত মন তাঁকে বৃহৎ জীবনের দিকে টেনে নিয়ে গেল, তিনি শিক্ষাঙ্গনের নির্দিষ্ট গণ্ডি অতিক্রম করে নিজেকে

ছড়িয়ে দিলেন ভারতের অগণিত যন্ত্রণাক্লিষ্ট মানুষের জীবনের কেন্দ্রে। নিশ্চিন্ত জীবন উপভোগের থেকে নির্যাতিত মানুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নিরন্তর লড়াই করাটাই তাঁর জীবনের মন্ত্র হয়ে দাঁড়াল, তাঁর এই সংগ্রাম তাঁকে পরিণত করল এক মানবাধিকার কর্মীতে। তাঁর তীক্ষ্ণ মনন ও গভীর দায়বদ্ধতা তাঁকে পৌছে দিয়েছিল বিস্তৃত জগতে। প্রথম দিকে তিনি নকশালবাড়ি আন্দোলনের সমর্থক থাকলেও পরবর্তীকালে তিনি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বদলে ফেলেছিলন। অবিরাম হিংসার পরিবর্তে মানুষের অধিকারের লড়াইয়ের পথ ও আইনের শাসনের জন্য দাবি প্রতিষ্ঠাকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছিলেন। যদিও তিনি রাজনৈতিক হিংসার বিষয়ে তাঁর বহু গবেষণার মধ্যে একথা উল্লেখ করতে ভোলেননি যে অনুন্নয়ন এবং বঞ্চনার স্বাভাবিক পরিণতি হিংসাশ্রয়ী রাজনীতি। এ বিষয়ে তাঁর একটি মতামত উল্লেখযোগ্য। তিনি দেখিয়েছেন যে ভারতে হিংসাশ্রয়ী বা অহিংস কোন রাজনীতিই সরকারকে জনবিরোধী নীতি প্রণয়ন থেকে বিরত করতে পারেনি। এ বিষয়ে তাঁর মতামত, এ দেশের ব্যবস্থার পরিকাঠামোগত পরিবর্তনই একমাত্র লক্ষ্য হতে পারে ।

এই আশির দশকের প্রথমেই তিনি দেখেছিলেন রাষ্ট্রের ভয়ঙ্কর হিংসা ও দমনপীড়ন যা তাঁর চেতনার মূলে গিয়ে আঘাত হেনেছিল। তিনি নিজে মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী হলেও এই রাজনীতির যে লক্ষ্যহীন ব্যক্তিসন্ত্রাস এবং হিংসা তিনি তার বিরোধী ছিলেন। হিংসা তাঁকে বিচলিত করেছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন যে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কখনই কোনভাবে, কোন আইন বলে অপর একটি রাজনৈতিক দলের ওপর ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য কোন অজুহাতেই হিংসার আশ্রয় নিতে পারে না। পারে না কোনভাবে মানুষের আত্মসম্মান নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে। সরকারের কোনও অধিকার নেই আইনের বাইরে গিয়ে মানুষকে কোনরূপ আক্রমণ করার। কোন স্পর্শকাতর মানুষ তা মেনে নিতে পারে না। রাষ্ট্র কেবল শৃঙ্খলা রক্ষার অজুহাতে এই নির্মমতা ঘটাতে পারে না। সেই সময় তিনি যুক্ত হলেন এ.পি.সি.এল.সি র সাথে (১৯৮৩)। তখন প্রায় এক হাজার জনযুদ্ধ কর্মী রাষ্ট্রের পুলিশ বাহিনী দ্বারা বেআইনী হত্যার শিকার হয়েছিল। তিনি এই সব ঘটনার তথ্যানুসন্ধান করলেন এবং অবিরত এই হিংসার রাজনীতি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য উভয় পক্ষকে আলোচনায় বসতে উৎসাহিত করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত ২০০২ সালে দুই পক্ষ বসেছিল। তিনি তাঁর মতাদর্শকে দেশের আইনের আওতায় রেখেই একের পর এক তীক্ষ্ণ প্রবন্ধ লিখে চলেছিলেন। কিন্তু রাজনৈতিক দর্শনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের অমানবিকতাকে এবং স্বৈরাচারী রূপকে প্রশ্নের সম্মুখে দাঁড় করিয়েছিলেন। এর পাশাপাশি এর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বহুত্ববাদের অবস্থান নিয়েছিলেন। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বালাগোপাল শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের কৌশল সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট একমাত্রিকতায় বিশ্বাসী ছিলেন না, যা জীবনের সায়াহ্নে লিখিত রিফ্লেকশন অন ভায়োলেন্স অ্যান্ড নন ভায়োলেন্স ইন পলিটিক্যাল মুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া (২৬ জানুয়ারি ২০০৯)-তে লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

গুজরাটের দাঙ্গার সময় বালাগোপালের ভূমিকা ছিল সক্রিয়, গুজরাটের অসংখ্য মানুষের সাথে কথা বলে তিনি বুঝেছিলেন আদিবাসী ও উচ্চবর্ণের হিন্দুদের একসারিতে ফেলার এক সচেতন প্রচেষ্টা চলছে হিন্দুত্ববাদীদের দ্বারা, এই ভয়ঙ্কর দাঙ্গায় রাষ্ট্রের ভূমিকা ও মূল রাজনৈতিক দলগুলির হিন্দুয়ানার মধ্যে আদিবাসীদের অর্ন্তভুক্তিকরণের প্রতিবাদে তিনি তাঁর বিভিন্ন লেখা প্রকাশ করেছেন। হিন্দু-মুসলিম, হিন্দু-খ্রীষ্টান, বর্ণহিন্দু-দলিত, নারী-পুরুষের ভয়ঙ্কর বৈষম্য আজও আমাদের দেশের মানুষের মধ্যে গভীর ভাবে শিকড় গেড়ে আছে, শুধু তাই নয়, রাষ্ট্র তার ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে এই ভাবনাকে কোথাও প্রকাশ্যে কোথাও গোপনে বহন করে নিয়ে চলেছে। যার বিরুদ্ধে তাঁর লড়াই অব্যাহত ছিল। তাঁর শ্রেণী সংগ্রামে বিশ্বাসী মন ভারতের এই জাতিভেদের কলঙ্কিত বৈষম্যকে চিহ্নিত করতে একটু বেশি সময় নিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তারপর থেকে তিনি থেমে থাকেননি।

বেআইনি উচ্ছেদ নিয়ে তাঁর আন্দোলন সর্বজনবিদিত। খাম্মামের বক্সাইট খনি এলাকায় বন সংরক্ষণের অজুহাতে পোলাভরন প্রোজেক্ট কার্যকরী হয় এবং এর ফলে আদিবাসী জনজীবনের ওপর নেমে আসে চূড়ান্ত রাষ্ট্রীয় শোষণ নিপীড়ন। সরকার কার্যত আদিবাসীদের বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করে। অন্ধ্রের ৯টি জেলা আদিবাসী অধ্যুষিত। উন্নয়নের নামে সরকার বেআইনীভাবে আদিবাসীদের সম্পত্তি অধিগ্রহণের কর্মসূচি গ্রহণ করে। ধনীদের স্বার্থে বনভূমি উন্মুক্ত করে দিতে চায়, বনবাসীদের নিজস্ব অধিকার থেকে বঞ্চিত করার চক্রান্ত ঘনীভূত হয়ে উঠে। বালাগোপাল তাঁর সাথীদের নিয়ে আইনের দরজায় তখন বারংবার আঘাত করে চলেছেন। রাষ্ট্র আদিবাসীদের কথা শোনেনি, তাদের মতামত কেউ চায়নি, এমনকি তাদের অভিযোগও আদালত পর্যন্ত পৌছায়নি। বালাগোপাল উদ্যোগ নিয়ে তাদের আইনের কাছে পৌছে দিয়েছেন। মানুষ হিসাবে তাঁর দায়বদ্ধতা তাঁকে বাধ্য করিয়েছে এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে, সরকারের কাছে এই কাজের ব্যাখ্যা চাইতে ও আদিবাসী মানুষদেরকে জানাতে যে প্রকৃত অর্থে তাদের অধিকার কতটুকু, সরকার কেন বাধ্য তার কাজের স্বচ্ছতা রাখতে এবং এ বিষয়ে জনগণকে সমস্ত তথ্য জানাতে। এরপর হাইকোর্ট রায় দিয়েছে, কিন্তু তবুও সেই লড়াই সরকার বাস্তবায়িত হতে দেয়নি। সরকার বলেছে ওই বনবাসীরা নকশাল আন্দোলনের সাথে জড়িত।

একই ঘটনার সাথে তিনি জড়িত হন ছত্তিশগড়ের দান্তেওয়াড়াতে, সেখানকার বনবাসীদের মাওবাদী বলে জঙ্গল থেকে দলে দলে বহিষ্কার করা হতে থাকে। উদ্দেশ্য — জল, জঙ্গল, জমি থেকে মানুষদের উৎখাত করে দেশি বিদেশি পুঁজিমালিকদের লুঠের সুযোগ করে দেওয়া এবং তার থেকে বখরা পাওয়া। ছত্তিশগড়ের সরকার তাঁদের তাঁবে থাকা মানুষদের আগ্নেয়াস্ত্র সরবরাহ করে এক ফৌজ বানিয়েছে, যার নাম সালোয়া জুডুম। উদ্দেশ্য, মাওবাদীদের খতম করা। সালোয়া জুডুমকে আইনি মান্যতা দিতে তাদের পুলিশ হিসাবে নিয়োগপত্র দিয়ে বনাঞ্চলে অবস্থিত বিভিন্ন থানায় নিয়োগ করতে থাকে। বালাগোপাল এই জঙ্গল থেকে বিতাড়িত মানুষদের ভবিষ্যৎ, এদের পুনর্বাসন নিয়ে বারবার সোচ্চার হয়েছেন, দেশের আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের অধিকার নিয়ে সরব হয়েছেন। আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে বৃহত্তর গণআন্দোলনই একমাত্র পথ হতে পারে বলে তিনি মনে করতেন।

আজকের পশ্চিমবঙ্গের লালগড় ঠিক একই রকম চিত্র বহন করছে। মানুষের বেঁচে থাকার আন্দোলনকে মাওবাদ বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে, জঙ্গী দমনের মহাকার্যে সামিল করা হয়েছে হাজার হাজার আধা-সামরিকবাহিনীকে, জঙ্গলে মানুষের জীবন প্রতিপদে খর্বিত, নির্যাতিত, অত্যাচারিত হচ্ছে। যাদের জীবন রক্ষা করার দায়িত্ব নিয়ে সেনার প্রবেশ ঘটানো হয়েছে তারা পালিয়ে বাঁচার পথ পাচ্ছে না। তারা নিজেদের রক্ষা করার তাগিদে তৈরি করেছে জনগনের কমিটি। প্রতিনিয়ত সেনাবাহিনীর হাতে আক্রান্ত হচ্ছে মানুষ। গ্রামের মেয়েরা যৌন হেনস্থা ও ধর্ষণের আশঙ্কায় ভয়েভয়ে দিন গুজরান করছে, সরকারি রাজনৈতিকদল তাদের গুণ্ডাবাহিনীকে মিশিয়ে দিচ্ছে সেনাবাহিনীর মধ্যে, হিংসা ও প্রতিশোধ স্পৃহার এক অনন্ত প্রতিযোগিতা চলেছে। প্রাণ দিতে হচ্ছে নিরীহ গ্রামবাসীদের, সংবাদ মাধ্যম প্রতিদিন যে খবর পেশ করে, বাস্তব তার

থেকে আরও অনেক ভয়ঙ্কর। সোনামুখী গ্রামে গিয়ে দেখেছি সেখানে পুরুষ মানুষ ভয়ে গ্রাম ছেড়ে দলে দলে পালিয়ে যাচ্ছে, শুধুমাত্র মাওবাদী হিসাবে চিহ্নিত হবার ভয়ে। ঘটছেও তাই, কোন কারণ, প্রমাণ কোন কিছুর তোয়াক্কা না করেই হাজার হাজার মানুষকে শারীরিক ও মানসিক অত্যাচারের শিকার হতে হচ্ছে। মানুষের আত্মসম্মানকে এইভাবে পদদলিত করা, তার আত্মমর্যাদায় আঘাত হানার যে নারকীয় প্রক্রিয়া সারা ভারত জুড়ে চলেছে তার প্রতিটি কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবার জন্য তিনি দায়বদ্ধ ছিলেন। তিনি কেবল রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস নয়, যে কোন ব্যক্তিহত্যার বিরোধী ছিলেন। কখনই তিনি ব্যক্তি সন্ত্রাসকে গৌরবান্বিত করতে রাজি ছিলেন না। কারণ সন্ত্রাস দিয়ে মানুষের হৃদয় জয় করা যায় না, সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ সর্বদাই সন্ত্রাসের বিরোধিতা করে থাকে। বালাগোপাল বিশ্বাস করতেন রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যেই হিংসার বীজ লুকিয়ে যেমন থাকে, তেমনই দেশের ধনী ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরা তাদের শোষণ কায়েম রাখার জন্য হিংসার পথ নিয়ে থাকে। কিন্তু এই হিংসাকে রুখতে হিংসাকে কাজে লাগানো কতটা যুক্তিযুক্ত এ বিষয়ে তিনি সন্দিহান ছিলেন। তিনি কখনই হত্যাকে মেনে নিতে পারেননি। লালগড় প্রসঙ্গে তিনি এও বলেছিলেন যে গরিব মানুষদের স্বার্থে যেসব দল তৈরি হয়েছে তারাও এই গরিব মানুষদের সেই সুরক্ষা দিতে পারেনি, মানুষের মধ্যে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। যার ফলে এই মানুষরা দু'ভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এখানে বালাগোপালের অবস্থানকে উদ্ধৃতি ব্যবহার করা যায় যে — সেইসব ব্যক্তিকে হত্যা করা হচ্ছে যাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে মাওবাদীরা উদাসীন, সাথে সাথে নিপীড়নের ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার পেছনে সেই ব্যক্তিটির কতটুকু ভূমিকা সে বিষয়ে মাওবাদীরা চিন্তিত নয়। মাওবাদীদের দ্বারা সংগঠিত হত্যা আজ এক অদ্ভুত অবস্থা সৃষ্টি করেছে, সমগ্র অঞ্চল গ্রাস করেছে আতঙ্ক। মাওবাদীরাও অন্য মতামত বা তার প্রকাশের অধিকারের পূর্ণ বিরোধী।

বালাগোপালের মৃত্যু সমগ্র দেশের মানবাধিকার আন্দোলনের পক্ষে এক গভীর শোক বহন করে এনেছে। যে মানুষটি ভারতবর্ষের আসমুদ্র হিমাচল ঘুরে বেরিয়েছেন কেবল মানুষের নির্যাতন খুব কাছ থেকে গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করার জন্য, তাঁর অভাব আমরা মানবাধিকার কর্মীরা সর্বতোভাবে উপলব্ধি করব। বিশেষ করে আজ তাঁর কথা মনে হচ্ছে যখন এই ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র বিনায়ক সেনের মতো অঙ্গীকারবদ্ধ এক মানবাধিকার কর্মীকে, আমাদের অপর এক সহযোদ্ধাকে, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করার আদেশ দিয়েছে।

গত কয়েকদিনে আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন সুরেন্দ্রমোহন এবং কান্নাভিরণ। সুরেন্দ্রমোহনের জরুরি অবস্থার সময়ের ভূমিকা, পরবর্তীতে পি,ইউ,সি,এল. পুনর্গঠনে ভূমিকা এবং মৃত্যুপূর্ব পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে কণ্ঠস্বরকে কেউ স্তব্ধ করতে পারেনি। ঠিক তেমনই আমরা হারালাম কান্নাভিরণকে। এ.পি.সি.এল.সি.-র অন্যতম প্রতিষ্ঠতা, পি.ইউ.সি.এল.-এর সর্বভারতীয় সভাপতি, সুদক্ষ আইনজীবী, সর্বোপরি, মানবাধিকার রক্ষায় এক নিবেদিত প্রাণ ছিলেন আমাদের প্রিয় কান্না। বালাগোপাল যখন এ.পি.সি.এল.সি.-র সম্পাদক, কান্না তখন তার সভাপতি। তাঁদের যৌথ নেতৃত্বে এ.পি.সি.এল.সি. তখন সারা দেশের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের কাছে পৌছেছিল।

আজ আমরা এমন এক অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছি যে সমগ্র দেশে বিশ্বায়নের হাওয়া উঠেছে, মানুষ বাজার অর্থনীতির প্রভাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে, কেবল নিজে ভালোভাবে বাঁচার আকাঙ্ক্ষা মানুষকে গ্রাস করে নিয়েছে। প্রতিবাদের কণ্ঠগুলো নিস্তেজ হয়ে আসছে, এমন এক দুর্দিনে মানবাধিকারের পক্ষে সোচ্চার যে কয়েকজন মানুষ অত্যাচারিত মানুষের পাশে থেকে তাদের সাথে গলা মিলিয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন কে বালাগোপাল। তাঁর মৃত্যু আমাকে শোকস্তব্ধ করেছে। তাঁর উত্তরসূরীরা নিশ্চয় তাঁর অসমাপ্ত কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনে হিংসা ও অহিংসার প্রতিফলন

প্রয়াত কে. বালাগোপালের (জন্ম ১০ জুন ১৯৫২, মৃত্যু ৮ অক্টোবর ২০০৯) এই প্রবন্ধটি ২৬ জানুয়ারি ২০০৯ 'সাউথ এশিয়া সিটিজেন্‌স ওয়েব'-এ প্রকাশিত হয়েছিল। প্রাসঙ্গিকতার বিচারে এটির বাংলা অনুবাদ এখানে প্রকাশ করা হল। অনুবাদক জিতেন নন্দী।

জনআন্দোলনের কার্যহীনতা নিয়ে জনপরিসরে এক ধরনের নিষ্প্রাণ আলোচনা দেখা যায়। এইসব আন্দোলন বড়ো জোর কোন ঘটনার গতিকে কমিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই পারে না। ওইসব আলোচনা অনেক সময় হিংসা-অহিংসার দিকে গড়িয়ে যায় — প্রশ্নটা নৈতিক কোন বিকল্প হিসেবে ওঠে না, ওঠে রণনৈতিক উপায় হিসেবে। কিছু মানুষ একটার পর একটা ধরনায় বসে কোন ফল না পেয়ে হিংসাত্মক উপায়ের দিকে ঈর্ষাকাতর চোখে তাকায়, আবার অনেকে সশস্ত্র গোষ্ঠী ছেড়ে এসে 'নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন' (এনবিএ)-এর দ্বারা আকৃষ্ট হয়।

এখন এই বিষয়ে কিছুটা খোলামেলা পরিবেশ রয়েছে যেটা ভালোই, গোঁড়া মনোভাবের জন্য বেশ কিছুটা ক্ষতি হয়েছে। যদি বলা হয়, হিংসার ব্যাপারে কারও গোঁড়া হওয়া উচিত নয়, নৈতিকভাবে এরকম অবস্থান নেওয়া হয়তো কিছুটা অনিশ্চিত। এমনকী জীবনের মূল্য সম্পর্কে একটা আপেক্ষিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ না করেও অথবা লড়াইয়ের মধ্যে কেউ জখম হলে তার নৈতিক দায় নেওয়ার ক্ষেত্রে হালকা দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ না করেও এটা কিন্তু একটা যুক্তিগত অবস্থান। এটা অনেকটাই প্রাসঙ্গিকভাবে সঠিক। কিন্তু আলোচনাটা বিকল্পের কার্যকারিতার মূল্যায়নের দিকে চলে যায়। সেক্ষেত্রে দূর থেকে দেখলে বাস্তবকে কিছু আশা আর কিছু ধরে নেওয়া, এমনকী মোহজালের মধ্য দিয়ে ঘোলাটে করে তোলার সম্ভাবনা থেকে যায়। প্রত্যেক রণনীতি থেকে কী পাওয়া গেছে, তার একটা বাস্তবোচিত মূল্যায়ন এই তর্ককে অপেক্ষাকৃতভাবে তথ্যপূর্ণ করে তুলতে পারে।

সোজাসাপটা সত্যটা হল এই যে, সমস্ত রণনীতিই কিছু অন্যায়কে রোধ করতে পেরেছে, কিন্তু কোন রণনীতিই কোন ক্ষেত্রে সামান্য একটা গুরুত্বপূর্ণ নীতিকে ফিরিয়ে নিতে সরকারকে বাধ্য করতে পারেনি। সমাজ ও অর্থনীতির কাঠামোগুলির মধ্যে নিহিত ঝোঁকগুলিকে কোন রণনীতিই ঘুরিয়ে দিতে পারেনি। যদিও আমাদের জানা কোন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক আন্দোলন কিংবা সামাজিক লড়াই কেবল শোষণকে লঘু করা অথবা কিছু ত্রাণের উন্নতির জন্য শুধুমাত্র কাজ করে না। সকলেই মনে করে, দেশের শাসন — এবং সম্ভবত সমাজের পরিকাঠামো ব্যবস্থাও — মৌলিকভাবে ত্রুটিপূর্ণ এবং তার সংস্কার দরকার, হয়তো তা উল্টে ফেলাও দরকার। আমরা কি তার কোন কার্যকর রণনীতির কথা জানি? আমি রাজনৈতিক

রণনীতিগুলির কথা বলছি না, কিন্তু যে সংগ্রামের রণনীতিগুলি সফলভাবে রাষ্ট্রের ওপর চাপ তৈরি করতে পারে এবং যে সাংগঠনিক প্রক্রিয়া তার গতিকে থামিয়ে দিতে পারে, আমি সেগুলির কথা বলছি। লড়াইটা শ্রেণী, জাত অথবা অন্য যে কোন সামাজিক জোটকে ঘিরে হয়তো গড়ে উঠতে পারে। শেষ পর্যন্ত তা সংস্কার চাইতে পারে কিংবা কাঠামোটাকেই উল্টে দিতে পারে। এটা প্রধানত বা অংশত কাঠামোর ভিতরে কাজ করতে পারে, কিংবা সবটাই তার বাইরে হতে পারে। যেটাই হোক না কেন, সাধারণ সমস্যাটা হল : এদেশের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, কোন কিছু খারাপ মনে হলেই সরকারগুলি তাকে রোধ করে না; এমনকী সাংবিধানিক নির্দেশসমূহ এবং উদ্দেশ্যের বিপরীত হলেও তারা সেটা করে না। সরকারগুলি তখনই কোন আন্দোলনকে থামায়, যখন একসঙ্গে নিয়ে চলা প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। কোন গণতান্ত্রিক বিধান এমনটা হওয়া উচিত নয়, কিন্তু ভারতীয় গণতন্ত্র এমনটাই। আপনি আপনার সমালোচনা কতটা সত্য তা নিয়ে মুখ নীল হয়ে যাওয়া অবধি চালিয়ে যান, কিংবা গলা ধরে যাওয়া অবধি চেঁচিয়ে যান, কিছুই আসে যায় না। সমস্ত আন্দোলনের সামনে এটাই প্রশ্ন, কারোরই উত্তরটা জানা নেই। হিংসাত্মক বা শান্তিপূর্ণ, সমস্ত রণনীতিই বুঝতে পেরেছে, তারা সাফল্যহীন নয় — যদি সাফল্য বলতে বোঝায় স্থানীয় দমনমূলক শক্তিগুলিকে বা বিশ্ব স্তরের শক্তিগুলির স্থানীয় প্রকাশগুলিকে বাধা দেওয়া; এবং প্রান্তিক স্তরে যারা এসবের শিকার, তাদের অবস্থার উন্নতি ঘটানো কিংবা আরও কিছু। এইসব সাফল্যকে কেউ খাটো করতে চায় না, আর যাই হোক না কেন, এসবের জন্য কিছু সুবিধা যারা পায় তারা কৃতজ্ঞও বটে, আর খাটো করাতে কোন আলাদা ফল তারা পায় না। কিন্তু এর বাইরে যাওয়ার কোন চেষ্টা এক অনতিক্রম দেওয়ালের সামনে সকলকে দাঁড় করিয়ে দেয়, সেটাই হল ভারতীয় গণতন্ত্রের সীমাবদ্ধতা।

নকশালপন্থীরা, বিশেষত তাদের মধ্যে বৃহত্তম মাওবাদীরা, হিংসাত্মক লড়াইয়ের রণনীতি প্রয়োগ করে বেশ ফল পেয়েছে বলে একটা সাধারণ স্বীকৃতি রয়েছে। স্থানীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর ওপর তাদের যথেষ্ট প্রভাব নিয়ে কোন সন্দেহ নেই। তেলেঙ্গানা থেকে বিহার পর্যন্ত, স্থানীয় সমাজ যে অবস্থায় আজ রয়েছে, তা তাদেরই ওলটপালোট ঘটানোর ফল। সমস্ত ধরনের বদমায়েসি আর ভণ্ডামিকে রোধ করার ব্যাপারে তাদের প্রতি ভয়ও যে একটা দারুণ কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে, সেটাও সত্য। কিন্তু প্রায় চল্লিশ বছরের নকশাল আন্দোলনের দিকে ফিরে তাকালে অবাক হতে হয়, রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত সিদ্ধান্তসমূহ অথবা অসম বিকাশের যৌক্তিকতার মধ্যে নিহিত ঝোঁকগুলিকে প্রতিহত করার ক্ষেত্রে কোন ভূমিকাই তারা নিতে পারেনি। বাস্তবে, এরকম একটা নজিরও কেউ খুঁজে পাবে না। তারা নিজেরা হয়তো জবাব দিতে পারে, এর কারণ হল তারা এর চেষ্টাই করেনি। এটা ঠিক যে তাদের রণনৈতিক চিন্তা রাষ্ট্রকে রাজনৈতিকভাবে পরাস্ত করার দিকে নিবদ্ধ নয়, বরং সামরিকভাবে এর বিরুদ্ধে জমায়েত করা। অতএব বড়োসড়ো রাজনৈতিক আঘাত হানা অথবা অসম বা ধ্বংসাত্মক বিকাশের গতিকে ঘুরিয়ে দেওয়া তাদের এজেন্ডায় নেই। যদিও এটাও সত্যি যে, চেষ্টা করলেও ওইসব সিদ্ধান্ত বা শক্তিসমূহকেও কীভাবে রোধ করতে হয়, তা তারা জানে না। সোজা কথায় বললে, আপনারা একজন জমিদারের মাথায় বন্দুক ধরতে জানেন বটে, কিন্তু স্পেশাল ইকোনমিক জোন বা ভারত-মার্কিন পরমাণু চুক্তির বন্দুক ঠেকানোর মতো কোন মাথা নেই। বিষয়টার এই সরলীকরন হয়তো অন্যায্য বলে সমালোচিত হতেও পারে এবং কেউ বলতে পারে যে মাওবাদী হিংসা শুধুমাত্র কিছু ব্যক্তি রবিনহুডদের সশস্ত্র কার্যকলাপ নয়। তাসত্ত্বেও, বাস্তবসম্মত করে তোলার জন্য এই কঙ্কালটার গায়ে যথেষ্ট রক্তমাংস চাপিয়েও আপনারা উপহাসের মৌলিক সত্য থেকে মুক্তি পাবেন না।

এইসব বিষয়গুলির বিমূর্ততাই কেবল সেগুলির বিরুদ্ধে হিংসার প্রয়োগকে একটা পন্থা হিসেবে অকেজো করে তোলেনি। অন্তত এগুলির কিছু নির্দিষ্ট বহিঃপ্রকাশ থাকা দরকার, যাকে হিংসাত্মক জমায়েত বা সশস্ত্র কার্যকলাপ দিয়ে মোকাবিলা করা যায়। কিন্তু সামন্ততন্ত্র ছাড়া ক্ষমতার অন্য রূপগুলির সূক্ষ্মতা হিংসাত্মক কেন্দ্রীভূত মোকাবিলার ধরনগুলিকে কার্যকর করা কঠিন করে তুলেছে। হিংসা ভালো বা মন্দ, প্রয়োজনীয় বা অপ্রয়োজনীয় যাই হোক না কেন, তা কিন্তু সবসময়ই মোটা দাগের। অন্যদিকে, ক্ষমতার বুদ্ধিমান প্রয়োগ হল সূক্ষ্ম। সাধারণভাবে, পুঁজিবাদী যুক্তিবাদও একইরকম। কখনও কখনও তা কাঁচাভাবে দমনমূলক হলেও সবসময় তা নয়। পুঁজিবাদ মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলির জন্য উন্নততর জীবন এবং গরিবদের চাকরির প্রতিশ্রুতি নিয়েও আসে। পুঁজিবাদ তার কাজের নিদর্শন সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেয় এবং প্রত্যেকে তার যৌক্তিকতাকে তুলে ধরে। এ বহু ভাষায় কথা বলে, প্রত্যেক স্বরেই ধ্বনিত হয় এক সীমাবদ্ধ যৌক্তিকতা আর এর সমগ্রতা লুকিয়ে থাকে অন্ধকারাচ্ছন্নতা ও এড়িয়ে চলার কৌশলের স্তরগুলির পিছনে। এর মিথ্যাগুলির জন্য দরকার পড়ে বুদ্ধিমান কারিকুরি আর সেই মিথ্যাকে নিশ্চল করে রাখার জন্য দরকার পড়ে এর সৈন্যসামন্তের এক সূক্ষ্ম পরিচালন। কারণ উন্নততর লড়াইয়ের রণনীতিতে গণ-কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হল, বিরোধীকে নিশ্চল করে দেওয়া এবং সেক্ষেত্রে হিংসাত্মক উপায়গুলি শান্তিপূর্ণ উপায়গুলির চেয়ে এগিয়ে রয়েছে। কিন্তু একটা স্পেশাল ইকোনমিক জোনকে অকার্যকর করতে কাকে বা কী নিশ্চল করবেন আপনি?

আর সেখানেই এসে পড়ে আইন আর তার প্রয়োগের ব্যবস্থাগুলি। যখন একজন জমিদার বা স্থানীয় উৎপীড়কের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক প্রস্তুতি ব্যবহার করা হয়, আইন অবশ্য পাল্টা আঘাত হানে না। যখন সমালোচিত উন্নয়নের পরিকল্পনা অথবা জাতীয় নিরাপত্তার সমালোচিত নীতিগুলিকে হিংসাত্মক উপায়ে আটকানো হয়, তখন কিন্তু তেমন কোন জোরদার প্রতিক্রিয়া কিংবা জোরালো সামাজিক অসম্মতি দেখা যায় না। বিক্ষোভের ফলে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়, হিংসাত্মক বিক্ষোভে তা আরও বেশিই হয়। এর ফলে যে নিরাপত্তাহীনতা আর অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়, তার ফায়দা নেয় রাষ্ট্র। এই মওকায় সে বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে মানুষকে খেপিয়ে তোলে। এমনকী বিক্ষোভকারীদের লাঞ্ছিত করার সুযোগ পর্যন্ত সে নেয় অথবা রাষ্ট্র নিজের দমনপীড়নের হিংস্র কায়দাকে এই সুযোগে ঢাকা দেয়। এমনকী তার দমনপীড়ন একটা ন্যায্যতাও পেয়ে যেতে পারে। যখন জোরদার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, সামাজিক অসম্মতিকে স্বাভাবিক স্তর অতিক্রম করে গড়ে তোলা যেতে পারে। আমরা সকলেই জানি, বিক্ষোভগুলির বিরুদ্ধে কী পরিমাণ ঘৃণা রাষ্ট্র সৃষ্টি করতে পারে, বিশেষত হিংসাত্মক বিক্ষোভের ক্ষেত্রে এবং যদি সে মনে করে তার গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থগুলিতে ঘা লাগছে। আর সেটাই তখন আইনের বেআইনি প্রয়োগের যুক্তি হয়ে উঠতে পারে। সে ততই বেআইনি পথ নিতে পারে, সমাজে সে একটা ক্ষোভের যতখানি ন্যায্যতা জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়।

তখন একটা উপায় হল, হাত ঝেড়ে ফেলে বলা যে, পুঁজিবাদ যতক্ষণ ক্ষমতায় থাকবে ততক্ষণ একটা দূরের বেশি লড়াই চালানো বেকার। আর আসল কাজ হল রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করা এবং গণ্ডগোলের উৎসটাকে হটানো। একদিক থেকে এর মানে বোঝা যায় বটে, কিন্তু অন্যদিকে একটা ফাঁক থেকে যায়। তৃতীয় একটা দিক থেকে প্রশ্নটা দেখার

দরকার পড়ে। এখানে ফাঁকটা থাকছে কারণ, আমরা একটা স্তরে নিজেদের কাছে এই সমাজ বা এই ব্যবস্থাপনা নিয়ে প্রশ্ন তুলছি না। বরং খোদ গণতন্ত্র নিয়ে এবং জনসাধারণের অসম্মতির দ্বারা পরিচালন–ব্যবস্থাকে সংশোধন করার বাধ্যবাধকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছি। আমি বলি যে এই নিয়ে আমাদের অনেক বেশি সময় দেওয়া দরকার, কেননা আমরা ক্ষমতায় আসতে চাইছি এবং তখন আমরা বিষয়টা দেখব, এটা কোন উত্তর নয়। প্রশ্নটা অন্য আরেকদিক থেকে আসছে, কারণ যদি আপনি দুষ্ট পরিচালনের বিরুদ্ধে কার্যকর সংখ্যায় জনসাধারণকে কীভাবে সমাবেশিত করতে হয় তা না জানেন, কীভাবে আপনি নিশ্চিত যে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য তাদের সমাবেশিত করতে আপনি জানেন? হিংসাত্মক সমাবেশের চেয়ে শান্তিপূর্ণ সমাবেশের একটা সুবিধা রয়েছে। অধিকতর সংখ্যায় মানুষ তাতে অংশ নিতে পারে এবং সেখানে অধিকতর সূক্ষ্মতা নিয়ে অভীষ্ট স্থির করা ও তার জন্য বিক্ষোভের পন্থা নির্মাণ করা যায়। সেখানে বিক্ষোভ চলাকালীনও কথাবার্তার পরিসর পাওয়া যায়, তা যত না প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে, তার চেয়ে বেশি সমাজের সঙ্গে। আর এতে বিচারবিমর্ষের গুরুত্বপূর্ণ দিকটা জীবন্ত থাকে। তার জন্য বিক্ষোভকে গুটিয়ে ফেলতে হয় না। এটা সেই বিরোধীপক্ষের সঙ্গে লড়াইয়ে জরুরি, যে এক প্রগাঢ় যুক্তিবোধের জগতে কাজ করে। এটা হল একটা কারণ, কেন সংগ্রামের শান্তিপূর্ণ উপায়গুলি কেবল নৈতিকভাবেই নয়, রাজনৈতিকভাবেও বেশি স্বাস্থ্যকর। কিন্তু কার্যকারিতার দিক থেকে, নীতিগত সিদ্ধান্তসমূহ বা কাঠামোগত ঝোঁকগুলির মোড় ঘোরানোর ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ উপায়গুলি হিংসাত্মক উপায়গুলির চেয়েও বেশি অকার্যকর। সম্পূর্ণ সরলভাবে, ধরনা, পথনাটিকা, হরতাল, একটানা আধঘন্টা রাস্তা অবরোধ, পথসভায় ভাষণ আর জাঠা চিরকাল চালু থাকতে পারে। তাতে রাষ্ট্র বা আম্বানির কিছুই হারানোর নেই। এতে প্রায়শই কর্মীরা হতাশ হয়ে পড়ে আর তাদের মধ্যে মাওবাদীদের সঙ্গে বসবার একটা তাগিদ সৃষ্টি হয়। যখন এত উত্তেজিত হয়ে পড়ে, তাদের তখন মনে হয় যে হিংসা নিয়ে একমাত্র সমস্যা হল, এটা নৈতিকভাবে ঝামেলার এবং দৈহিকভাবে বিপজ্জনক। কাজেই তখন ধরে নেওয়া হয় এটা বেশি কার্যকর। তা নয় এবং তা হয়নি।

আমরা কি নির্বাচনের সময় ছাড়া আইনকে জন–অসম্মতির কাছে প্রশাসনের জবাবদিহির জন্য ব্যবহার করতে পারি? ভারতে আমরা যে সাংবিধানিক গণতন্ত্রের কথা জানি, এরকম আশা করার তাতে কোন সুযোগ নেই। কিন্তু কর্মীদের কাছে জনস্বার্থ মামলার দারুণ আকর্ষণ রয়েছে। আইন এবং বিচারের মাধ্যমে রায় পাওয়ার সমাজবিদ্যা সম্পর্কে অজ্ঞতা থেকেই এধরনের ঝোঁক অনেকটা তৈরি হয়েছে। গড়পড়তা বুদ্ধিমান ভারতীয় জনস্বার্থ মামলাকে জামিনের সমকক্ষ বলে মনে করে। এটা হল সেই ভালো রাজার মতো, যাঁর সুখ্যাতি হল, তিনি তাঁর প্রাসাদের বাইরে মরীয়া প্রজাদের সামনে উপস্থিত হন এবং তাঁদের অভিযোগ শুনে সঙ্গে সঙ্গে রায় দেন। গড়পড়তা বুদ্ধিমান ভারতীয় এটাও মনে করে, বিচারক্ষমতার সমস্ত সীমাবদ্ধতা — যার সম্পর্কে সে অন্যথায় ওয়াকিবহাল — ঘুচে যায়, যখন আদালত জনস্বার্থ মামলা শুনতে বসে, অর্থাৎ বিচারালয়ের সদয় শাসকেরা সমস্ত খারাপকে সমুচিত রায়দানের মধ্য দিয়ে ঠিকঠাক করে দিতে পারে। এই ধরনের মোহের একমাত্র কারণ হল এক মরীয়াভাব। বিচারালয়ের সমাজবিদ্যা না জানাটা কম অপরাধ। একটা শ্রেণী হিসেবে বিচারকেরা, উদারনীতির জমানা থেকে সমস্ত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ঝোঁক নিয়েই রয়েছে। এর পিছনে সূক্ষ্ম কোন কারণ নেই, তারা সেই সামাজিক শ্রেণীর অন্তর্গত, যারা এইসব ঝোঁক থেকে সুবিধা পেয়েছে এবং আরও অনেকটাই পাবে। জনস্বার্থ মামলাগুলি সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্ট চপল উচ্ছ্বাস নিয়ে অতি–উপহাসমূলক মন্তব্যগুলি করেছে এই কারণে, যাতে কর্মী বা মরীয়া নাগরিকদের দিল্লিতে ছুটে আসার হ্যাপা না পোয়াতে হয়। আইন–পত্রিকাগুলিতে সুপ্রিম কোর্টের বিচারমূলক কর্মতৎপরতা সম্পর্কে বিচিত্র মত, এমনকী বিদ্রুপপূর্ণ মন্তব্য নজরে এসেছে। কিন্তু সেই বৈচিত্র্যের গণ্ডি রক্ষণশীল বিচারমূলক কর্মতৎপরতা এবং তার রক্ষণশীল বিরূপতার মধ্যে সীমিত।

এই ব্যবস্থার লুন্ঠনগুলি বন্ধ করার উপায় উদ্ভাবন করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। যেহেতু ভারতীয় গণতন্ত্র যৌক্তিক সমালোচনাকে মর্যাদা দিতে শেখেনি, তাই সেই সমালোচিত নীতিগুলির রূপায়নকে দৈহিকভাবে প্রতিরোধ করার সামর্থ অর্জন করা ছাড়া উপায় নেই। বিক্ষোভ আন্দোলনগুলির মাধ্যমে সেই সামর্থ্য অর্জন করা যেতে পারে। নীতিগতভাবে, ভুক্তভোগী জনসাধারণকে বিপুল সংখ্যায় সমাবেশিত করা এবং রাষ্ট্র ও পুঁজির চলাচলের পথের মাঝে দৈহিকভাবে বসে পড়া হল সর্বোত্তম পদ্ধতি। কিন্তু সেখানে জনসাধারণ তাদের নির্দিষ্ট রূপে বিচিত্র স্বার্থ এবং কৌমসমাজগুলির একান্ত অবস্থান দ্বারা খণ্ডিত, দারিদ্র্য ও দুর্দশার দ্বারা নিষ্পেষিত, সুবিধাবাদের রোগে দুর্বল — এমনকী একদম নিচেরতলায়, যা ভারতীয় রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে কংগ্রেস দলের সবচেয়ে বড়ো অবদান, তাদের রাজনৈতিক অতিথিদের সঙ্গে যোগসাজশে ক্ষীণবল এবং বিক্ষোভ ও আন্দোলনের ফাঁকা বুলি আর নৈতিক অবক্ষয়ে মোহমুক্ত। বিশেষত, জনসাধারণ দেখে, যে কর্মীরা আগের যুগে ব্যক্তিগত আচরণে আত্মত্যাগের পরিচয়ে পরিচিত ছিল, এখন আর তা নেই। আমার মনে হয়, এই কাণ্ডটা এনজিও–দের সবচেয়ে বড়ো অকাজ। কিন্তু এই সংস্কৃতি এখন রাজনৈতিক কর্মীদের একটা বড়ো অংশের মধ্যে সাধারণভাবে দেখা যাচ্ছে। অন্যদিকে, রাজনীতিকরণের ফলে জনসাধারণের নিরীহ ভালোমানুষি আর নেই, প্রায়শই তারা লড়াইয়ের মূল্য ও ফলগুলিকে অতীতের তুলনায় অধিকতর সতর্কতার সঙ্গে মাপজোক করে নেয়। তাদের দোষ দেওয়া যায় না। বিশেষত সেই সতর্কতার দিকটা আরও গেঁড়ে বসে যখন কর্মীরাও নিজেরা আজকাল একই মনোভাব দেখায়। সব মিলিয়ে শক্তিশালী সমাবেশ ঘটানো কঠিন এবং তার ফলে সৎ কর্মীরা শর্টকাট উপায় খোঁজে — সে সশস্ত্র কার্যকলাপ থেকে জনস্বার্থ মামলা পর্যন্ত যেটাই হোক। কিন্তু শর্টকাট তো কিছুই নেই।

খবরের কাগজ সংবাদমন্থন

এই পাক্ষিক সংবাদপত্রের সারা বছরের গ্রাহক–চাঁদা চল্লিশ টাকা।

ডাকযোগে পত্রিকা সংগ্রহ করার জন্য টাকা পাঠান এই ঠিকানায় :

জিতেন নন্দী, বি ২৩/২ রবীন্দ্রনগর, বড়তলা, কলকাতা ৭০০০১৮

দূরভাষ : ২৪৯১৩৬৬৬, ই–মেল : manthansamayiki@gmail.com

সালওয়া জুডুম নিয়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন : সর্বাধিক বন্ধুত্বপূর্ণ একটি তদন্ত

প্রয়াত কে. বালাগোপালের এই প্রবন্ধটি 'ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিকাল উইকলি' পত্রিকায় ২০ ডিসেম্বর ২০০৮-এ প্রকাশিত হয়েছিল। প্রাসঙ্গিকতার বিচারে এটির বাংলা অনুবাদ এখানে প্রকাশ করা হল। অনুবাদক জিতেন নন্দী।

সালওয়া জুডুমের বিষয়টি নিয়ে বেশ কিছু রিপোর্ট প্রকাশ হয়েছে। সেগুলির বেশিরভাগই কড়া সমালোচনামূলক। বিষয়টি ছত্তিশগড় সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে। যারা রাজ্যের দান্তেওয়াড়া জেলার পরিস্থিতি সম্পর্কে জানে (এখন দান্তেওয়াড়া ও বিজাপুর) এবং ভালো মনের লোক, তারা অনেকেই এইসব সমালোচনা নিয়ে আপত্তি করবে না। যদিও সালওয়া জুডুম বলতে ঠিক কী বোঝায়, তার মূল্যায়ন নিয়ে তফাত হতে পারে, আর হয়ও। কিন্তু যে কোন ভালোমানুষ এটা দেখে বিচলিত হবে যে বেশির ভাগ রিপোর্টে মাওবাদীদের সম্পর্কে কোন সমালোচনামূলক মন্তব্য প্রায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

ভালোমানুষেরা কেবল বিচলিতই হবে, কিন্তু দক্ষিণ বস্তারের জঙ্গলে ও গ্রামগুলিতে বিদ্রোহী-দমনে নিযুক্ত যে কোন কর্মীর কাছে এই রিপোর্টগুলি অসহ্য মনে হতে পারে। কেউ যে এই হতভম্ব অবস্থাটা কাটিয়ে উঠে প্রতিহিংসামূলক পাল্টা কিছু নিয়ে হাজির হবে, তা ছিল কেবল সময়ের অপেক্ষা। সেই পাল্টা প্যারোডিটা এবার উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু এর রচয়িতা মহেন্দ্র কর্মার মতো কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু নয়, খোদ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (NHRC)। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ পাওয়ার পর NHRC একটা তদন্ত করে যে রিপোর্ট প্রস্তুত করেছে, তাকে সহজেই ওই প্রতিষ্ঠানের দেড় দশকের জীবৎকালের সবচেয়ে খারাপ অবস্থা বলে চিহ্নিত করা যায়।

ছত্তিশগড় সরকার দ্বারা সালওয়া জুডুম বলে পরিচিত প্রাইভেট বাহিনীকে ষড়যন্ত্রমূলক ছাড়পত্র দেওয়ার বিষয়কে প্রশ্ন করে সুপ্রিম কোর্টে দুটি রিট পিটিশনের শুনানি হয়েছে। কিছু বাইরের সংশ্লিষ্ট আবেদনকারী সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলিতে ব্যক্তিগতভাবে সফর করেছেন এবং সচক্ষে পরিস্থিতিটা দেখেছেন। তাঁরা বিস্তৃতভাবে সালওয়া জুডুমের চক্রাকার হিংসা এবং সেই দুষ্কর্মে সরকারের সহযোগিতার কথা প্রকাশ করেছেন। যারা ২০০৫ সালের জুন মাসের পরবর্তী দান্তেওয়াড়া সম্পর্কে এতটুকু জানে, তারা জানে সমস্ত গ্রামগুলি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং অন্ধ্রপ্রদেশের খাম্মাম জেলার সীমান্ত ঘেঁষা অবিভক্ত দান্তেওয়াড়া জেলার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমের বিস্তৃত ফসল কেটে নেওয়া মাঠ বরাবর গ্রামগুলির শত শত মানুষকে সালওয়া জুডুমের হাতে নিগৃহীত হতে হয়েছে।

তথ্য অনুসন্ধানকারী দল

সুপ্রিম কোর্ট অভিযোগগুলির ("নকশালপন্থী ও সালওয়া জুডুমের দ্বারা মানবাধিকার লঙ্ঘন সংক্রান্ত") ওপর একটা রিপোর্ট প্রস্তুত করা দরকার মনে করেছিল এবং সেই কাজের জন্য NHRC-কে বাছাই করেছিল। এক-একটা দোষ ধরে ধরে অভিযোগের সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার মতো তদন্ত করতে বলেনি। তারা "উপযুক্ত সদস্যদের নিয়ে একটা যথার্থ তথ্য অনুসন্ধানকারী দল" নিযুক্ত করে NHRC-কে অভিযোগগুলি পরীক্ষা/যাচাই করে দেখতে বলেছিল। NHRC-র নিজেদের সদস্যদের মধ্য থেকে দল নিয়োগ করার দরকার ছিল না। তারা এইসব বিষয়ে কিছু অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং ভালো মনের মানুষকে বেছে নিতে পারত। অথবা তারা নিজেদের সদস্যদের মধ্যে যাদের বিচার/প্রশাসন সংক্রান্ত জানাবোঝা আছে, তাদের নিয়ে দল তৈরি করতে পারত। কেন NHRC তাদের পুলিশ বিভাগকে তথ্য অনুসন্ধানকারী দল গঠন করার নির্দেশ দিল, সেটা তারাই সবচেয়ে ভালো জানে। NHRC-র ডাইরেক্টর জেনারেল (ইনভেস্টিগেশন) সম্ভবত অবশ্যম্ভাবীভাবে তাঁর তত্ত্বাবধানে তিন আইপিএস (ইন্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিস) অফিসার ও নিচেরতলার অন্য পুলিশ-কর্মীকে নিয়ে দলটি গঠন করেন।

সমস্ত দিক থেকে এটা ছিল এক দুর্ভাগ্যজনক মনোনয়ন এবং রিপোর্টে তার যথেষ্ট মাত্রায় ছাপ রয়েছে। পুলিশ অফিসাররা, অবসরপ্রাপ্ত বা কর্মরত, দুর্নীতিপরায়ন বা উদ্ধত, সাধারণভাবে সকলেই সালওয়া জুডুম সম্পর্কে মহা প্রশংসা করেছে। সর্বদা সশস্ত্র বিদ্রোহকে সশস্ত্র প্রতিরোধের দৃষ্টি থেকে দেখে তারা এটাকে এক আদর্শ হাতিয়ার মনে করেছিল; আদিবাসী সমাজের একটা নজরদারি গোষ্ঠীকে জনবিদ্রোহ হিসেবে চালিয়ে দেওয়া যেতে পারে এবং রাষ্ট্রের নোংরা কাজের প্রয়োজনে তাদের সহজেই শাস্তির হাত থেকে রেহাই দেওয়া যেতে পারে। রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, নিছক NHRC-তে নিযুক্ত হওয়ার ফলে একজন পুলিশের (পুরুষ বা মহিলা) কাজের জায়গাগুলি বদলায়নি। এমনকী সবচেয়ে অবিচলিত গণতন্ত্রীর পক্ষেও কোন বিদ্রোহ বা সশস্ত্র কার্যকলাপ, যার একটা সামান্য অথবা যথেষ্ট গণভিত্তি আছে, মানবাধিকারের প্রেক্ষিত থেকে দেখা সহজ নয়। পুরুষ বা মহিলা পুলিশকর্মী যাদের অস্ত্রের ওপর নিজেদের একচেটিয়া দখলদারি নিয়ে পেশাগত অপছন্দ রয়েছে, তাদের পক্ষে এই অবস্থান নেওয়া মুশকিল। দান্তেওয়াড়ার পরিস্থিতি (অর্থাৎ দান্তেওয়াড়া ও বিজাপুর) নিয়ে তদন্ত করার জন্য শুধু পুলিশ অফিসারদের নিয়ে একটা দল গঠন করা এক চরম দুঃখজনক সিদ্ধান্ত এবং সেটাই দেখিয়ে দিচ্ছে নিজের কাজ সম্পর্কে NHRC-র বোঝাপড়া কত খারাপ।

রিপোর্টটির নিরপেক্ষতা বা বাস্তবতা নিয়ে কোন রাখঢাক নেই। ১৩ পৃষ্ঠার ভূমিকাতে রয়েছে মূলত নকশালদের সম্পর্কে একটা কঠিন মন্তব্য, একদম গোড়াতেই তাকে "বিপজ্জনক" বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এরপরে রয়েছে পাঁচ পৃষ্ঠার একটা অধ্যায়, যার শিরোনাম "নকশালদের দ্বারা মানবাধিকার লঙ্ঘন"। তৃতীয় অধ্যায় হল মাত্র দেড় পৃষ্ঠার "সালওয়া জুডুমের দ্বারা মানবাধিকার লঙ্ঘন" এবং আরও দেড় পৃষ্ঠা জুড়ে "স্থানীয় পুলিশ, নিরাপত্তা বাহিনী ও এসপিও-দের ভূমিকা"। এতে প্রায় দুঃখপ্রকাশ করে বলা হয়েছে, সালওয়া জুডুম ত্রাণশিবিরের বাইরে আর কাজ করতে পারে না। আর তারপরেই রয়েছে ৬৭ পৃষ্ঠার এক দীর্ঘ অধ্যায়, যার শিরোনাম হল "ফাইন্ডিংস", যেখানে রিট পিটিশনে তালিকাভুক্ত অভিযোগগুলি সম্পর্কে দলটির তদন্ত-রিপোর্ট রয়েছে।

মাওবাদী কার্যকলাপ

এটা হয়তো যোগ করা যেতে পারে, মাওবাদীরা এই মনগড়া ধারণা কমানোর জন্য কিছুই করেনি। তদন্ত চলাকালীন তারা বিদ্যুৎ সরবরাহের হাই টেনশন লাইন উড়িয়ে দিয়ে ১০ দিন গোটা অঞ্চলকে (নির্দিষ্টভাবে চারটি জেলা) অন্ধকারে ডুবিয়ে দেয়। যে কোন সময়েই এটা একটা কাণ্ডজ্ঞানহীন কাজ, কিন্তু মাওবাদীদের তিন বছরের কার্যকলাপ সম্পর্কে অভিযোগগুলির তদন্ত চলাকালীন এটা করা ছিল নেহাত বোকামি। যারা তাদের কাজকর্মের পদ্ধতি সঙ্গে পরিচিত নয়, তারা এটা দেখে বিস্মিত হতে পারে যে, কেন এই ধরনের ধ্বংসাত্মক ঘটনা ঠিক এই সময়ে তারা ঘটালো। কিন্তু মাওবাদীদের ক্ষেত্রে এই যথাযথ বোধের অভাব বিস্ময়কর বা নতুন কিছু নয়। তারা স্বীকার করুক আর নাই করুক, রাষ্ট্রের অধীনস্থ

জন–বিচারমূলক প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়াগুলির প্রতি এই ধরনের ঘৃণার প্রকাশ ঘটানো মাওবাদীদের ক্ষেত্রে খুবই সাধারণ ব্যাপার। তাদের কাছে যা অন্যায্য বলে মনে হয়, সেগুলির বিরুদ্ধে এইসব প্রতিষ্ঠানের তদন্ত ও আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানানোর ক্ষেত্রে কিন্তু তারা বিরত হয়নি।

নকশালদের সম্বন্ধে আলোচিত প্রতিটি অংশে তাদের বিরুদ্ধে NHRC–র বদ্ধমূল ধারণা প্রকাশ পেয়েছে। বাস্তবে রিপোর্ট পড়ে যে কেউ হতভম্ব হয়ে যাবে, কীভাবে নকশালরা আদৌ ওই অঞ্চলে টিকে আছে : পড়ে মনে হয় যে নকশালদের একমাত্র কাজ জনসাধারণকে অত্যাচার করা। এমনকী যে সামান্যতম কৃতিত্ব তাদের প্রতি অসহানুভূতিশীল মধ্যবিত্ত শ্রেণী সাধারণত দিয়ে থাকে, যেমন, অসাধু ব্যবসায়ী ও দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারি কর্মচারীদের ঘুষ খাওয়া মাওবাদীরা বন্ধ করে দিয়েছে, এটুকুও রিপোর্টে নেই। যারা NHRC–র চেয়ে অনেক বেশিদিন এই অঞ্চলে কাটিয়েছে, তারা কখনও যে অভিযোগ শোনেনি, সেটা এই রিপোর্টে রয়েছে, যেমন, "নকশালদের হুকুম অনুযায়ী কোন আদিবাসী বাচ্চাকে পাঁচ ক্লাসের বেশি পড়াশুনা চালাতে দেওয়া হয় না"। প্রায় নিশ্চিতভাবে বলা যায়, এটা রাস্তার ধারের কোন ত্রাণশিবিরের উদ্ভাবন। আশ্চর্যভাবে, নকশালদের বিরুদ্ধে তালিকাভুক্ত বিবৃতিগুলি উপযুক্ত সতর্কতার সঙ্গে কোন "অভিযোগে বর্ণিত" বা "মনে হয়" বিশেষণ ছাড়াই পেশ করা হয়েছে (কেবল রিপোর্টের প্রথম তিন পৃষ্ঠায় ১৬টি অভিযোগের মধ্যে একটিতে "অভিযোগে বর্ণিত" এবং আর একটিতে "রিপোর্টে পাওয়া" বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু যে বিপুল সংখ্যক আদিবাসী মানুষ ছত্তিশগড় থেকে অন্ধ্রপ্রদেশে পালিয়ে গেছে, তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, "অভিযোগে বর্ণিত" তারা সালওয়া জুডুমের দ্বারা উচ্ছেদ হয়েছে। তারা কি আদৌ সেখানে পিকনিক করতে যেতে পারে?

সবচেয়ে ডাহা মনগড়া ধারণা রয়েছে ১.২৯ অনুচ্ছেদে তেন্দুপাতার উল্লেখে। "তেন্দুপাতা হল এদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আয়ের উৎস", এটা অনেকটাই সত্য। এরপরে যোগ করা হয়েছে "তেন্দুপাতা সংগ্রহ ও তার রেট নির্ধারণের ওপর নকশালদের নিয়ন্ত্রণ আদিবাসীদের মধ্যে ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে"। সঠিকভাবে বললে, এই দুই বিবৃতির মধ্যে আরও দুটি কথা থাকা উচিত। একটা হল, তেন্দুপাতা ঠিকেদারদের দ্বারা আদিবাসীদের ভয়ানক শোষণ, নকশালদের দৃশ্যপটে আসার আগে যে আদিবাসীরা জঙ্গলে ওই পাতা সংগ্রহের কঠিন কাজটা নামমাত্র ভিক্ষের বিনিময়ে করত। দুই, নকশালদের হস্তক্ষেপের ফলে এই অঞ্চলে তাদের ২০ থেকে ২৫ বছরের সক্রিয়তার মধ্যে বাস্তবে এই উপার্জনটা অনেক গুণ বেড়েছে (প্রায় ৫০ গুণ)। এটা মাথায় বন্দুক ধরে অত্যধিক বেশি কিছু আদায় করা নয়, শুধুমাত্র পাতা সংগ্রহের কাজে যে পরিশ্রম হয়, তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একটা বৃদ্ধি। যদি এমনকী, যেটা প্রায়শই হয়নি, এটা পাতা–সংগ্রহকারীদের আন্দোলনের বদলে ঠিকেদারের মাথায় বন্দুক ধরেও আদায় হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রেও কথাটা একইভাবে সত্য। যাই হোক না কেন, এতে আদিবাসীদের হাতে খরচ করার মতো উপার্জন যথেষ্টই বেড়েছে এবং এটা একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক সুবিধা যেটা আদিবাসীরা নকশালদের সংগঠন ও উপস্থিতির ফলে পেয়েছে। যদি ত্রাণশিবিরগুলিতে কিংবা দান্তেওয়াড়ার গ্রামগুলিতে কেউ NHRC–র তথ্য অনুসন্ধানকারী দলকে একথা না বলে থাকে, তাহলে এটাই প্রমাণিত হয় যে কেউই সত্য কথা বলতে চায় না বা বলার মতো অবস্থায় নেই।

এটা সত্য যে পাতা সংগ্রহের বাড়তি মজুরির রেটের পাশাপাশি নকশালরা ঠিকেদারদের কাছে "পার্টি ফান্ড" দাবি করেছিল এবং নিয়েছিল। আর সালওয়া জুডুমের উত্থানের আগে গত কয়েক বছরে তেন্দুপাতা ঠিকেদাররা নকশালদের চাপের বিরোধিতা করার জন্য অনেক এলাকা থেকে ব্যবসা গুটিয়ে নিয়েছিল। এটাও সত্য যে ২০০৫ সালে ছত্তিশগড় সরকার তেন্দুপাতা ব্যবসার ঠিকেদারের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং তার বদলে আদিবাসীদের নিজস্ব সমবায় সমিতি গড়ে তোলে। এর বিরুদ্ধে নকশালরা ধর্মঘট ডেকে আদিবাসীদের পাতা তোলা বন্ধ করতে বলে। এ নিয়ে কিছু "ক্ষোভ" সৃষ্টি হতেই পারে, যেমনটা NHRC–র রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু যেভাবে রিপোর্টে বলা হয়েছে, তার থেকে একদম ভিন্ন একটা ছবি উঠে আসে।

ছত্তিশগড় সরকার যেরকম বলিষ্ঠভাবে সালওয়া জুডুমের উৎপত্তি সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেয়, সেভাবেই এখানে বলা হয়েছে। ৫ মে মাওবাদীরা সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্সের গাড়ি উড়িয়ে দেওয়ার পর এক আদিবাসী যুবকের গ্রেপ্তারির ঘটনায় বিজাপুর জেলার কারকেলি গ্রামে (ভুলভাবে কাঙ্কেলি উচ্চারণ করা হয়) ২০০৫–এর গ্রীষ্মে আদিবাসী জনতার জমায়েতের মধ্য থেকে সালওয়া জুডুম গড়ে ওঠে। এটা বলা হয়ে থাকে, এই ধরনের সশস্ত্র কার্যকলাপে জনসাধারণ ক্ষুব্ধ হয়, কারণ এতে তাদের প্রধানদের ওপর দমনপীড়ন নামে এবং শক্ত–সমর্থ যুবকদের জীবন ও স্বাধীন চলাফেরা খুবই আক্রান্ত হয়। এই ঘটনা নিয়ে কোন বিরোধ নেই, কারণ মাওবাদী–অনুপ্রাণিত এক প্রকাশনেও এই ক্ষোভের কথা বলা হয়েছিল। সেই প্রকাশনে যেটা ছিল না, এই ঘটনার সূত্রে কয়েকটি গ্রাম, যেমন তাদমেন্দ্রি, উসিকাপত্তনম, আমবেলি ইত্যাদিতে আদিবাসী মানুষেরা সভা করে। পুলিশের হাতে আদিবাসীদের নিগ্রহের বিষয়টা, যারা মাওবাদীদের সম্পর্কে অভিযোগ তুলেছিল বলে দাবি করা হয়, এই জমায়েতগুলিতে আলোচিত হয়। মনে হয় অনেকেই এইসব সভায় একতরফা হিংসাত্মক কার্যকলাপের জন্য মাওবাদীদের দায়ী করে, কারণ তাতে পুলিশকেই সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে।

সালওয়া জুডুমের গড়ে ওঠা

কিন্তু এইসব সভার সংখ্যাবৃদ্ধির মাধ্যমে সালওয়া জুডুম গড়ে ওঠেনি। এইসব ক্ষোভকে সামনে রেখে যখন মহেন্দ্র কর্মা নামে কংগ্রেসের এক দুর্নীতিগ্রস্ত ও উদ্ধত আদিবাসী নেতা, যাঁর মাওবাদীদের সম্পর্কে এক পুরনো বিদ্বেষ ছিল এবং যিনি দুই জন জাগরণ অভিযানের অভিজ্ঞ সৈনিক, একটা "আন্দোলন" গড়ে তোলার জন্য মঞ্চে আবির্ভূত হলেন, তখনই তৈরি হল সালওয়া জুডুম। আর তাঁর আবির্ভাবের পরবর্তীতে এটাকে আন্দোলন হিসেবে বর্ণনা না করে একটা নির্বিচার খুনে–বাহিনী বলাই ভালো। বাহিনী গ্রামে চড়াও হয়ে মানুষকে প্রাণনাশের বা ঘর জ্বালিয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে তাদের সঙ্গে যোগ দিতে বাধ্য করত এবং নতুন যোগ দেওয়া লোকেদের সমঝোতা করতে বাধ্য করত যাতে তারা পরের গ্রামে নিজেদের মতো আদিবাসীদের হত্যা ও লুন্ঠন করে।

নিঃসন্দেহে সবসময়ই সালওয়া জুডুমে এমন কিছু মানুষ আছে যাদের মাওবাদীদের প্রতি প্রকৃত ক্রোধ রয়েছে, যা নিয়ে মাওবাদীদের নিশ্চয় কিছু ব্যাখ্যা রয়েছে, কিন্তু এই পদ্ধতিতে এদের সংখ্যাটা বেড়েছে। আর এদের মূল কাজ হল গ্রাম খালি করা, প্রথমে মাওবাদীদের প্রতি সহানুভূতিশীলদের তাড়ানো আর তারপরে সকলকেই, যাতে ভূখণ্ডটা নিরাপত্তা বাহিনীর পক্ষে মাওবাদীদের খুঁজে খুঁজে উৎখাত করার জন্য ফাঁকা হয়ে যায়। এটা ছিল মহেন্দ্র কর্মার নেওয়া অতি সচেতন একটা সিদ্ধান্ত। একে প্রশাসন মদত করেছিল, যারা শিবিরগুলি বসানো বা বসানোর অনুমোদন দেয়। তৎকালীন অবিভক্ত দান্তেওয়াড়া জেলার দক্ষিণ ও দক্ষিণ–পশ্চিম অংশ জুড়ে সর্বত্র এই শিবিরগুলি আচমকা ব্যাপক আকারে গজিয়ে উঠেছিল।

NHRC দলের সদস্যরা সকলেই ছিলেন অভিজ্ঞ পুলিশ অফিসার, তাঁরা কেউই বিদ্রোহ দমনের এই প্রযুক্ত ও পরীক্ষিত পদ্ধতি সম্পর্কে না-জানার ভনিতা একেবারেই লুকিয়ে রাখতে পারেন না। এই পদ্ধতি বহু রাষ্ট্র অনুসরণ করেছে, যার মধ্যে আমাদের মিজোরামও রয়েছে। তাঁরা জানেন এবং তাই বেশ কষ্ট করে সালওয়া জুডুমের ব্যাখ্যা এড়িয়ে চলেন যাতে কোনভাবেই এর কোন তুলনা টানা না যায়। তার বদলে একে নকশাল অত্যাচারের বিরুদ্ধে এক আদিবাসী জনগণের প্রতিবাদ আন্দোলন হিসেবে চিত্রিত করা হয়, "নকশালদের হাতে দীর্ঘকাল ধরে অত্যাচারিত আদিবাসীদের এক অবরুদ্ধ আবেগের বিস্ফোরণ", "নকশালদের বিরুদ্ধে গ্রামবাসীদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলন" যা "নকশাল হামলায় রক্তাক্ত"।

"ফাইন্ডিংস" নামে লম্বা অধ্যায়ে NHRC দ্বারা রিট পিটিশনে উল্লেখিত অভিযোগগুলির ওপর এবং তথ্য অনুসন্ধানকারী দলের সফরকালে জনসাধারণের কাছ থেকে পাওয়া তদন্তের ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। প্রথমে পড়লে মনে হয়, সুপ্রিম কোর্টে আবেদনকারীদের আনা অভিযোগগুলির বেশিরভাগই ভিত্তিহীন। কিন্তু আরও খুঁটিয়ে পড়লে অনেক বেশি জটিল একটা গল্প পাওয়া যায়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রামের স্থানীয় লোকেরা রিপোর্ট অনুযায়ী বলেছে, অভিযোগের পিছনে ঘটনাগুলি সত্য নয় আর তাই যে সিদ্ধান্ত টানা হয়েছে, তা মিথ্যা। অন্য কিছু ক্ষেত্রে রিপোর্ট বলছে, সংশ্লিষ্ট গ্রাম জনশূন্য অথবা জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে অথবা স্থানীয় মানুষ ঘটনা সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রকাশ করেছে, অথবা তারা বলেছে যে অভিযোগে বর্ণিত খুন হওয়া লোকেদের অবস্থান তারা জানে না। সেইসব ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত টানা হয়েছে, অভিযোগ "প্রমাণিত নয়"।

একটা মাত্র দৃষ্টান্ত দেখা যাক, ৬.৪৬, ৬.৪৬.১ ও ৬.৪৬.২ অনুচ্ছেদে আবেদনকারীদের অভিযোগে বলা হয়েছে যে, মারকাপাল-এর এক ডালু রাউত সালওয়া জুডুম বা নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে খুন হয়েছেন। বৈরামগড় শিবিরে মারকাপালের গ্রামবাসীদের সঙ্গে NHRC দলের কতাবার্তা হয় এবং ডালু রাউত মারা গেছেন নিশ্চিতভাবে জানা যায়। কিন্তু যখন তারা বলে তিনি নকশালদের হাতে খুন হয়েছেন, "পাল্টা সওয়ালে তাদের কেউ কেউ বলে, তিনি নাগা ব্যাটেলিয়নের হাতে খুন হয়েছেন"। রিপোর্টে এটাও রয়েছে যে, তাঁর মৃত্যু নিয়ে আদৌ পুলিশের কোন নথি নেই। ফলাফল অংশে সিদ্ধান্ত টানা হয়েছে যে, "ডালু রাউত যে সালওয়া জুডুম বা নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে খুন হয়েছেন, তা প্রমাণিত নয়"।

এক তদন্তের দায়দায়িত্ব

কিন্তু কে তা প্রমাণ করবে? তদন্ত — যেহেতু NHRC দল তা করার কাজ হাতে নিয়েছে — অভিযোগকারী ও তদন্তকারীর মধ্যে এমন কোন শত্রুতামূলক খেলা নয়, যেখানে তদন্তকারী অভিযোগকারীকে অভিযোগ প্রমাণ করার চ্যালেঞ্জ জানাবে এবং সময় মতো সাক্ষ্যপ্রমাণ হাজির না করতে পারলে তার ব্যর্থতাকে বিজয়ীর মতো নথিভুক্ত করে নেবে। যে কোন আদালতে একটা অপরাধের মামলার বিচারে আমাদের দেশে যে আইন অনুসরণ করা হয়, তাতে বলা হয় অভিযোগকারীকে অভিযোগ প্রমাণের অসুবিধা ভোগ করতে হয় এবং অভিযোগকারী তা প্রমাণ করতে না পারলে মামলায় হেরে যায়। কিন্তু একটা অপরাধের তদন্তের ক্ষেত্রে এরকম কোন আইন বা আইনগত নীতি নেই। এটা তদন্তকারীর দায়িত্ব, যার অবস্থান অজানা সেই ব্যক্তির কী হল তা খুঁজে বার করা, কীভাবে জনশূন্য গ্রাম জনশূন্য হল এবং জ্বালিয়ে দেওয়া গ্রাম কীভাবে জ্বালানো হল, ইত্যাদি।

NHRC-র রিপোর্টে এরকম কোন উদ্যোগের ছাপ নেই। একটা গ্রামের জ্বলে যাওয়া অবশেষ নিয়ে কী তদন্ত করা হয়েছে, এমনকী তারা স্থানীয় পুলিশের কাছেও তা তদন্ত করেনি। কিংবা তারা নিখোঁজ লোকেদের অবস্থান সম্পর্কে জানে কিনা; অথবা তদন্তকারীদের মত হিসেবে গ্রামগুলিতে বা জঙ্গলে পাওয়া কোন মৃতদেহকে কীভাবে হত্যা করা হয়েছে। ছত্তিশগড় সরকারের নিযুক্ত মাইনে করা তদন্তকারীদের সঙ্গে যথেষ্ট কথা না বলে কীভাবে তারা এটা নথিভুক্ত করল যে একটা অভিযোগ যাচাই করে দেখা হয়নি বা প্রমাণিত নয়? তদন্ত এগিয়ে নেওয়ার জন্য যদি সংশ্লিষ্ট গ্রামে পাওয়া লোকেদের সঙ্গে কথা বলার চেয়ে বেশি কিছু করার সময় তাদের না থাকে, যদি সেই গ্রাম এখনও বাসযোগ্য এবং সেখানে বাসিন্দা থাকে, তাহলে তো এটাই নথিভুক্ত করা উচিত ছিল যে, তারা কোন সিদ্ধান্ত টানার অবস্থানে নেই। এটা সিদ্ধান্ত হতে পারে না যে অভিযোগটা "অপ্রমাণিত" বা যাচাই করার অযোগ্য। ঘটনা হল, এইভাবে বেশিরভাগ অভিযোগ খারিজ করে দেওয়ায় রিপোর্টে শেষে এসে যোগ করতে হচ্ছে, নিখোঁজ ব্যক্তিদের বিষয়টা অবশ্যই তদন্ত করতে হবে, "ফাইন্ডিংস"-এ দেওয়া সম্পূর্ণ বিভ্রান্তিকর ছবিটা সঠিক হিসেবে তুলে ধরে না।

কিছু ক্ষেত্রে, যেখানে অভিযোগটা হল সালওয়া জুডুমের হাতে একজন মানুষ খুন হয়েছে, রিপোর্ট বলছে লোকটা একটা "সংঘর্ষ"-এ মারা গেছে এবং ঘোষণা করছে যে অভিযোগটা মিথ্যা। যদিও, উপসংহারে নির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, সালওয়া জুডুমের শিকার হিসেবে যাদের নাম অভিযোগকারীরা তালিকাভুক্ত করেছে, তারা "নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত নকশাল"। এটা "তাৎপর্যপূর্ণভাবে" দেখা গেছে, রাষ্ট্র/সালওয়া জুডুমের হিংসার বলি হিসেবে অভিযোগকারীদের তালিকাভুক্ত অনেক নামই মাওবাদীদের দ্বারা প্রকাশিত একটা শহিদদের তালিকায় পাওয়া গেছে, যেটা এক পুলিশি তল্লাশির সময় উদ্ধার হয়েছে। এর তাৎপর্য কী তা স্পষ্ট নয়। কেন সালওয়া জুডুমের হিংসার শিকার একজন নকশালদের কাছে শহিদ হতে পারবে না? যদি সেই ব্যক্তি কোন মাওবাদী ফোরামের কর্মী হয়ে থাকে, যেমন দণ্ডকারণ্য আদিবাসী কিষান মজদুর সংগঠন, তাতে অভিযোগের কী অদলবদল হয়?

সালওয়া জুডুম ও সশস্ত্র বাহিনী

এটা সমান গুরুত্বপূর্ণ মত যে নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযানে নিহত হয়েছে বলে সরকারিভাবে ঘোষিত কাউকে সালওয়া জুডুমের হিংসার শিকার হিসেবে বর্ণনা করা উচিত নয়, এটা সমগ্র বিষয়ের কেন্দ্রীয় প্রশ্ন : দান্তেওয়াড়াতে কি সালওয়া জুডুম আর পুলিশ/সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে কখনও কোন তফাত বজায় রাখা হয়েছে? NHRC দল সাক্ষ্যপ্রমাণ সমেত এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না, কিন্তু এরকম একটা তফাতের পক্ষে খুবই কসরত করে সালিশি করেছে। একাধিক জায়গায় বলা হয়েছে, এই অঞ্চলে কার্যরত পুলিশ বা সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে সালওয়া জুডুমকে গুলিয়ে ফেলা উচিত নয়, এমনকী স্পেশাল পুলিশ অফিসারদের (এসপিও) সঙ্গেও গুলিয়ে ফেলা উচিত নয়, বাস্তবে যাদের সালওয়া জুডুম "আন্দোলন"-এর সবচাইতে সক্রিয় অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে বেছে নেওয়া হয়েছে। এখানে এসে রিপোর্টটা একটা পক্ষপাতপূর্ণ অনুগামীর বক্তব্যের মতো পড়তে লাগে এবং একটা নিরপেক্ষ অনুসন্ধান বলে মনে হয় না। বাস্তবে রিপোর্টের মূল সুর ও মর্ম হল সালওয়া জুডুমকে রক্ষা করা এবং অপরাধের অভিযোগে এর মর্যাদা যাতে নষ্ট না হয়। এমনকী যেখানে সালওয়া জুডুম কোন অপরাধ করেছে বলে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায়

নেই, সেখানেও তড়িঘড়ি আগ বাড়িয়ে নকশালরা আরও খারাপ কিছু করেছে বলে আড়াল করা হয়েছে। যেখানে পুলিশ সালওয়া জুডুমের বিরুদ্ধে কোন অপরাধ গণ্য করেনি বলে মেনে নিতেই হবে, সেখানে আবার তড়িঘড়ি যোগ করা হচ্ছে, সালওয়া জুডুমের আবির্ভাব ঘটার আগেই নকশালদের করা বহু অপরাধ রিপোর্টই হয়নি, কারণ জনসাধারণ অভিযোগ করতেই ভয় পেত। এতে অবশ্যই অভিযোগের জবাব হয় না, কারণ নকশালদের করা যে কোন অপরাধ নথিভুক্ত করা থেকে পুলিশকে কখনই বিরত করা হয়নি, তারা তো জানতই যে কেউ অভিযোগ করতে আসেনি। সালওয়া জুডুমের বিষয়ে এমনকী পুলিশের নজরের সামনে প্রকাশ্য হত্যা ও লুঠ নথিভুক্ত করা হয়নি।

পাল্টা–বিদ্রোহের কৌশল

NHRC দলের প্রতি বিশ্বস্ত থেকেও বলা যায়, বিশেষ এক মহেন্দ্র কর্মা সৃষ্টিতে না হলেও তার পিছনে নীতির প্রতি তারা পক্ষপাতদুষ্ট : এটা পুলিশের চোখে পাল্টা–বিদ্রোহের এক মূল্যবান কৌশল, যাকে অবৈধ বলে দেওয়া উচিত নয়, এমনকী তার মানে যদি আইনের অনুশাসন লঙ্ঘনের প্রামাণ্য নজিরগুলিকে এড়িয়ে যাওয়া হয়, তা হলেও তা অবৈধ নয়। এক্ষেত্রেও বলা হয়, "প্রমাণিত নয়"। আচ্ছা, তাহলে NHRC দল যদি পুলিশ পাহারা ছাড়া ওখানে যায়, তাদের যদি থামিয়ে তল্লাশি করা হয়, একমাত্র তখনই কেউ বলতে পারবে, সেটাই প্রমাণ করার সর্বোত্তম উপায়। আর যদি তারা অন্ধ্রপ্রদেশের একটা পরিচয়পত্র নিয়ে একটা গাড়িতে চেপে ওখানে ঘুরতে যায়, যেমনটা অনেকে যেতে বাধ্য হয়, তাদের এমন হৃৎকম্পন হবে যে, ওটা নিছক উৎসবের সময় আনন্দ করে টাকা তোলা, যেমন "বহু বছর ধরে বস্তারের আদিবাসীরা তুলে আসছে", এই সিদ্ধান্ত নাকচ হয়ে যাবে। (অন্য রাজ্যেও কি অ–আদিবাসী গ্রামবাসীরা এই ধরনের নিষ্পাপ অথচ বিরক্তিকর সময় কাটানোতে মাতে না? আর পুলিশ কি এটাকে জোর করে তোলা আদায়ের থেকে আলাদা হিসেবে জানে না?)

একটা ঘটনা অবশ্যই NHRC দলের নজরে এসেছে, সে দলে নিশ্চয় প্রশিক্ষিত তদন্তকারীরা রয়েছে। দান্তেওয়াড়ার গ্রামগুলিতে যেখানে একটা অত্যাচারের অভিযোগ স্পষ্টভাবে লোকে অস্বীকার করেছে, সেটা ঠিক বা ভুল স্পষ্ট বিবৃতির ভিত্তিতেই জানা গেছে। যেখানে সত্যটা একটা সম্ভাবনা, সেখানে গ্রামবাসীরা অস্পষ্ট ও অনিশ্চিত তথ্য দিয়েছে। আর অন্ধ্রপ্রদেশের সীমান্তের দু'পারে উচ্ছেদ হওয়া যেসব লোকের সঙ্গে দল সাক্ষাৎ করেছে, তাদের দেওয়া নির্দিষ্ট তথ্য আবেদনকারীদের অভিযোগগুলির চেয়েও বেশি নির্ভরযোগ্য।

NHRC–র দল তদন্ত শুরু করার আগে তাদের কাছে খুব স্পষ্ট একটা অনুরোধ করা হয়েছিল, অন্ধ্রপ্রদেশের ওয়ারাঙ্গেল ও খাম্মাম জেলার সদর দপ্তরের নির্ধারিত এলাকা ইটারনগরম ও ভদ্রচলমে জন–বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জনশুনানি করা হোক। কারণ সালওয়া জুডুমের মর্মান্তিক আক্রান্ত মানুষ এই দুই জেলায় পালিয়ে গিয়েছিল এবং সীমান্তের দু'পারে সালওয়া জুডুমের চোখকানের পরিধির চেয়ে সেখানে অনেক বেশি খোলামেলা মতামত দল পেতে পারত। কারণ যারা দান্তেওয়াড়ার গ্রামগুলিতে থেকে গিয়েছিল, তারা হয় সালওয়া জুডুমের সঙ্গে রয়েছে, আর নয় সালওয়া জুডুমের সঙ্গে থাকবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এতে একটা অংশের এমন কিছু তথ্য পাওয়া যেত, যার সবটা দান্তেওয়াড়ার গ্রামগুলিতে NHRC দলের শোনা নেতিবাচক মতামত নাও হতে পারত। NHRC–র কাছ থেকে এই অনুরোধের কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

আগে থেকে জনসাধারণকে না জানিয়ে NHRC দলের একটা উপদল অন্ধ্রপ্রদেশের কয়েকটা মাত্র গ্রামে গিয়েছিল। খাম্মাম জেলার চেরলা–তে একটা জনশুনানি হয়েছিল। এটা ওই জেলার মধ্যে বাস্তুহারা বস্তির সর্ববৃহৎ এলাকা থেকে দূরে এবং ওয়ারাঙ্গেল থেকে ওখানে যাওয়া অসুবিধাজনক। শুনানিতে কিছু উদ্বাস্তুর বিবৃতি নথিভুক্ত হয়েছিল। NHRC দল হয়তো সেটা বুঝতে পারেনি। কিন্তু সীমান্তের দু'পার থেকে চেরলায় আসা তেলেগুভাষী আদিবাসীরা সালওয়া জুডুমের হাতে ভয়াবহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ছত্তিশগড়ের মুরিয়া এবং অন্ধ্রপ্রদেশের গোট্টি কয়া বা গুট্টি কয়া আদিবাসী সমাজের মানুষেরা। তাদের কাহিনীগুলি ঠিকঠাকভাবে পেশ করা হলে দান্তেওয়াড়ার গ্রাম ও শিবিরগুলিতে শোনা বক্তব্যের পাল্টা মতামতের ভারসাম্য রক্ষা হত।

২০০৮ সালের ১০ জুন দান্তেওয়াড়ার এক বৈঠকে এদের একটামাত্র সারির বক্তব্য শোনার সুযোগ দলের হয়েছিল। নেন্দ্রা থেকে সালওয়া জুডুমের তাড়া খেয়ে পালিয়ে আসা লোকেরা তাদের জবানবন্দি পেশ করেছিল। কিন্তু রিপোর্টে এই বিবৃতিগুলিকে সন্দেহের চোখে দেখা হয়েছে। এতে কারও অবাক হওয়ার কিছু নেই। কারণ অন্ধ্রপ্রদেশে অবর্ণনীয় অবস্থায় থাকা উদ্বাস্তু মানুষের ছত্তিশগড়ে ফিরে যাওয়ার অনীহাকেও "চক্রান্তমূলক" মনে করা হয়েছে, কারণ NHRC দল মনে করে সালওয়া জুডুম "আর তাদের আসল চেহারায় নেই" (যার সঙ্গে রিপোর্টের অন্যত্র প্রকাশিত মতকে স্ববিরোধী মনে হয়, যেখানে বলা হয়েছে, সালওয়া জুডুম একটা শুভ জনগণের আন্দোলন)। যুক্তির দিক থেকে সালওয়া জুডুম সম্পর্কে একটানা "সন্দেহ" উড়িয়ে দেওয়া যায় না, তাতে অনীহার চক্রান্তমূলক চরিত্র অবশ্যই খারিজ হয় না। আসলে সন্দেহটা হচ্ছে, ওরা ফিরে যাক এটা নকশালরা চায় না; তারা এটাও চায় না উদ্বাস্তুরা রাষ্ট্র ও সালওয়া জুডুমের পক্ষে চলে যাক। পূর্বনির্ধারিত সিদ্ধান্তসমূহ বেশি দূর যেতে পারে না।

পাঠকের প্রতি

পত্রিকা সম্পর্কে আপনার মতামত ও পরামর্শ লিখে পাঠান। আপনার লেখা ও সমীক্ষা পাঠান।

সমস্ত যোগাযোগের জন্য

জিতেন নন্দী, বি ২৩/২ রবীন্দ্রনগর, বড়তলা, কলকাতা ৭০০০১৮

দূরভাষ : ২৪৯১৩৬৬৬, ই-মেল : manthansamayiki@gmail.com

উইকিলিকস প্রসঙ্গ

১

উইকিলিকস কী? এটা মূলত একটা ইন্টারনেট পরিসর বা ওয়েবসাইট, যা বিভিন্ন দেশের কিছু মানুষ মিলে বানিয়েছিল ২০০৬ সালে। প্রাথমিকভাবে এটা ছিল 'উইকি' নামক একটি ইন্টারনেট সফটওয়ার প্রযুক্তি দিয়ে বানানো ওয়েবসাইট, যেখানে যে কেউ কোনও মতামত বা 'ফাঁস করা নথি' খোলাখুলি রেখে দিতে পারে খুবই সহজে। কিন্তু কে ওই তথ্যটি রেখেছে, তা কেউ কিছুতেই জানতে পারবে না — সাংকেতিক ভাষা ব্যবহারের আধুনিকতম প্রযুক্তি ব্যবহার করে এই গোপনীয়তার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। তাছাড়াও, এই ফাঁস হওয়া সরকারি নথিগুলির তাৎপর্য নিয়ে আলাপ-আলোচনাও চলতে পারবে এই ওয়েবসাইটে। প্রাথমিক দিনগুলির এই 'সবাই স্বাগত' মার্কা মেজাজ অবশ্য বেশিদিন ধরে রাখতে পারে নি উইকিলিকস, কিছুদিনের মধ্যে এটা পরিণত হয় এমন একটা ওয়েবসাইটে, যেটা 'উইকি' প্রযুক্তি নির্ভর নয়, অর্থাৎ যে কেউ এখানে কিছু রেখে দিতে পারে না, পারে একমাত্র ওয়েবসাইটটির যে প্রশাসক বা অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, সে। প্রসঙ্গত, দুনিয়ার বেশির ভাগ ওয়েবসাইট এই দ্বিতীয় প্রকারের। আর কিছু ওয়েবসাইট আছে যেগুলোতে যে কেউ ওয়েবসাইটটির সম্পাদনা, পরিমার্জনা, সংযোজনা করতে পারে, এইরকম সবচেয়ে বিশাল ওয়েবসাইট হল মুক্ত ইন্টারনেট বিশ্বকোষ উইকিপিডিয়া। এই উইকিপিডিয়া ছিল উইকিলিকস নির্মাতাদের অনুপ্রেরণা। উইকিলিকসের নিজের ভাষায়, 'উইকিপিডিয়া যে ধরনের বিশ্বকোষ, উইকিলিকসও সেই ধরণের তথ্য-ফাঁসের কারবার'।

আরেকজন অনুপ্রেরণা ছিল উইকিলিকসের — ড্যানিয়েল এলসবার্গ। মার্কিন দেশের সরকারি কর্মচারি এই লোকটি আমেরিকার ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় সেই যুদ্ধের মার্কিন তরফের কিছু গোপন নথি 'পেন্টাগন পেপারস' ফাঁস করে দিয়ে দেন মিডিয়াকে। এই নথির মধ্যে দিয়ে দেখা যায়, আমেরিকা ভিয়েতনাম যুদ্ধ নিয়ে নিরন্তর মিথ্যা কথা বলে চলেছে নিজের দেশের মানুষকে, — প্রকাশিত সরকারি বয়ান এবং এই গোপন নথিতে যুদ্ধের আসল চেহারা সম্পূর্ণ আলাদা। ভিয়েতনাম যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলনে মিডিয়াতে ফাঁস হওয়া নথি ইন্ধন দিয়েছিল।

উইকিলিকসের আদত ওয়েবসাইটের (২০০৮-এর মার্চ মাসে) মতে, 'আজ বেশিরভাগ দেশে কর্তৃত্ববাদী সরকার, গণতান্ত্রিক সরকারগুলির মধ্যেও কর্তৃত্ববাদী প্রবণতা বাড়ছে, আর দায়মুক্ত কর্পোরেশনগুলির ক্ষমতাও বেড়ে চলেছে। ফলে উন্মুক্ততা এবং স্বচ্ছতার প্রয়োজন আজ সবচেয়ে বেশি। উইকিলিকস সেই প্রয়োজন মেটানোর একটি হাতিয়ার। উইকিলিকস সত্যবাদীর ঝুঁকি কমায়, ফাঁস হওয়া নথির যথাযথ প্রকাশ এবং আলাপ আলোচনার ব্যবস্থা করে। ... দুনিয়ার মানুষ এই তথ্যগুলি পর্যালোচনা করতে পারে, এর তাৎপর্য লোককে জানাতে পারে। যদি চীনা সরকারের একটি নথি প্রকাশ হয়, সমগ্র চাইনিজ প্রতিবাদী কৌম এটা খোলাখুলি বিচার করতে পারে এবং আলোচনা করতে পারে। যদি সোমালিয়ার কোনও নথি ফাঁস হয়, সোমালিয়ার উদ্বাস্তুরা তাকে বিশ্লেষণ করে সঠিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে ব্যবহার করতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হলো, উইকিলিকস জনগণের প্রথম নজরদার সংস্থা (ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি)। ... এর কোনও বাণিজ্যিক বা জাতীয় স্বার্থ নেই। সত্য প্রকাশই এর একমাত্র স্বার্থ। ... সব সরকারি অফিসিয়াল, প্রতিটি আমলা, প্রত্যেক কর্পোরেট কর্মী — যারা প্রতিষ্ঠানটির গোপন তথ্য, যা লোকের জানা দরকার, তা ফাঁস করে দেবে — উইকিলিকস তাদের সহযোগিতা করবে।'

২০০৬ সালের ডিসেম্বর মাস থেকেই এরকম অনেক গোপন নথি ফাঁস করলেও উইকিলিকস প্রথম পাদপ্রদীপে আসে ২০০৭ সালের আগস্ট মাসে, যখন ইংল্যান্ডের গার্ডিয়ান পত্রিকা, একটি বামঘেঁষা বড়ো মিডিয়া, উইকিলিকসের ফাঁস করা নথি থেকে একজন কিনিয়ান নেতার পরিবারের দুর্নীতির কথা নিয়ে খবর বের করে। সে বছরই নভেম্বরে গুয়ান্তানামো বে কারাগারে ইরাকি বা আফগান যুদ্ধের বন্দীদের সঙ্গে মার্কিন সেনার কার্যাবলির নিয়মকানুন (২০০৩-এর মার্চ মাসের) প্রকাশ্যে আনে উইকিলিকস। ২০০৮ সালে সুইস ব্যাঙ্ক জুলিয়াস বায়ের-এর বেআইনি কার্যকলাপের অভিযোগ প্রকাশ্যে আনে তারা এবং ওই ব্যাঙ্কের মামলার কারণে কয়েকদিনের জন্য ওয়েবসাইট বন্ধ থাকে, যদিও উইকিলিকস-এর প্রতিচ্ছবি ওয়েবসাইট বা মিরর ওয়েবসাইট সঙ্গে সঙ্গে চালু করে দেওয়া হয়। এরপর উইকিলিকসে ফাঁস হয় মার্কিন উপরাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী অতি দক্ষিণপন্থী সারা পালিনের সমস্ত ইমেল, ইংল্যান্ডের অতি দক্ষিণপন্থী পার্টি বিএনপি-এর সমস্ত সদস্যের নাম। ২০০৯ সালে উইকিলিকসে প্রচুর নথি ফাঁস হয়, তার মধ্যে আছে ইরানে সদ্য ঘটে যাওয়া একটি পরমাণু দুর্ঘটনার নথি, আইসল্যান্ডের দেউলিয়া হতে বসা ব্যাঙ্কের পুঁজি গায়েব করে দেওয়ার নথি (২০০৮ সালের)। ২০১০ সালে এপ্রিল মাসে উইকিলিকসে প্রকাশিত হয় ইরাকে একটি মার্কিন বিমানহানার ভিডিও, যাতে জঙ্গী ভেবে ভুল করে রয়টারের দু'জন সাংবাদিককে মেরে ফেলা হয়েছিল। অক্টোবর মাসে আফগানিস্তান এবং ইরাকে মার্কিন আগ্রাসনের সময়ের কয়েকলক্ষ মার্কিন নথি ফাঁস হয়। তারপর ২৮ নভেম্বর থেকে বেরোতে শুরু করেছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মার্কিন দূতাবাসগুলি থেকে মার্কিন দেশে পাঠানো গোপন নথি। এবার অবশ্য একবারে কিছু বেরোচ্ছে না, বেরোচ্ছে প্রতিদিন কয়েকটা করে, এরকম প্রায় আড়াই লক্ষ নথি আছে, ১৯৬৬ থেকে ২০১০-এর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময়কালের।

২

উইকিলিকস সম্পর্কে এত কথা বলার কারণ, উইকিলিকস বিষয়টিকে পরিষ্কার করা প্রথম প্রয়োজন। লোক জানাজানি চিরকালই ভয় পায় শাসকরা। কেবল রাষ্ট্র নয়, কর্পোরেটের কার্যকলাপেরও একটা বড়ো অংশ অত্যন্ত গোপনীয়। এবং কেবল রাষ্ট্র বা কর্পোরেটই নয়, বিভিন্ন বড়োসড়ো প্রতিষ্ঠান, এমনকী বড়োসড়ো মানুষও লোক জানাজানি বিষয়টিকে ভয় পায়। কেন? কারণ যে কোনও বরেণ্য, বড়ো প্রতিষ্ঠান, এবং অবশ্যই রাষ্ট্র, কর্পোরেট — এদের সবারই টিঁকে থাকতে শেষ বিচারে বন্দুক-টন্দুক বল ভরসা নয়, ভরসা জনমানসে স্বীকৃতি, এক ধরনের সমর্থন। তাই বড়ো, বরেণ্য, শক্তিশালীর বিরুদ্ধে পাতি লোকের লড়াইয়ের একটা গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র এই লোক জানাজানি। কিন্তু কী করলে লোক জানাজানি হয়?

আমাদের সমাজে এর বিভিন্ন উপায় আছে। যেমন, এমন কারোর কানে খবরটা পৌঁছে দেওয়া, যার স্বভাবই হলো গোপন জিনিস পাঁচ কান করে বেড়ানো। গ্রাম সমাজে এই পাঁচ কান করাকে লোকে ভয় পায়। এখনও। নৈতিকতার যে বাঁধুনিটা সেখানে আছে, তার অন্যথা হলে পাঁচ কান হয়। সেই নৈতিকতার ভালো মন্দ দুই-ই আছে। কিন্তু লোক জানাজানির পদ্ধতিটা সেখানে রয়েছে, যাতে সমাজের সবাই সেই নৈতিকতাকে মেনে চলে তা নিশ্চিত করার জন্য। নৈতিকতা যদি না মানা হয়, তাহলে তো সমাজ আইন আদালতে যায় না, আইন-আদালত সমাজে খুব গ্রহণযোগ্য কোনও বিচার-বিবেচনা এখনও নয়। তাই লোক

জানাজানির ওপর ভর করে এক ধরনের মানসিক নির্যাতনের মধ্যে দিয়ে, কখনও বা বাড়াবাড়ি হলে আরও বড়ো নির্যাতনের মধ্যে দিয়ে শোধরানোর পদ্ধতি রয়েছে। এই নির্যাতনেরও ভালো খারাপ দুই-ই রয়েছে।

রাষ্ট্রীয় পরিসরে অবশ্য রয়েছে আইন-আদালত। কিন্তু কী হবে সেখানে যেখানে আইন আদালত ন্যায়-নৈতিকতার গ্যারান্টি দিতে পারে না? আর কী-ই বা হবে যদি বিষয়টি আন্তঃরাষ্ট্রীয় কোনও ব্যাপার হয়? বা আন্তর্জাতিক কোনও ব্যাপার হয়? সেসব ক্ষেত্রে আইন আদালতে ন্যায় নৈতিকতা পাওয়া বেশ শক্ত। কবে থেকেই তো বলা হচ্ছে আন্তর্জাতিক আদালতে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে বুশ-ব্লেয়ারের বিচার হওয়া উচিত, আফগানিস্তান-ইরাকে আক্রমণের জন্য। হচ্ছে কি?

এসব ক্ষেত্রে রাজনীতির একটি চালু ধারণা, প্রচারে নিয়ে আসা। কারোর অন্যায়কে প্রচার করার মধ্যে দিয়ে অনেক মানুষের কাছে তা 'এক্সপোজ' করে দেওয়া। এর মধ্যে দিয়ে জনমানসে স্বীকৃতি, সমর্থন কমিয়ে দেওয়া যায়। তার মধ্যে দিয়েই একটা ন্যায়ের চেষ্টা। রাজনীতির কারবারিদের চেয়ে এই এক্সপোজ করা ও প্রচার করার কাজটি অনেক ভালোভাবে করে আধুনিক মিডিয়া। বিশেষত বড়ো মিডিয়া। একটি গালভরা শব্দই এর জন্য ঢুকে পড়েছে মিডিয়ার শব্দকোষে — ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম। তদন্তমূলক সাংবাদিকতা। আমাদের দেশে খাস খবর বা খোঁজ খবর ধরনের টিভি প্রোগ্রামে যার হদিস রয়েছে। এই এক্সপোজ ও প্রচার রাজনীতির হাত ধরে শব্দকোষে ঢুকে পড়েছে অনেক শব্দ, যেমন বে-নাকাব করা, মুখোশ খুলে দেওয়া। পাতি লোকের হাতিয়ার হিসেবে এই ধরনের সাংবাদিকতার অস্তিত্ব রয়েছে অনেকদিনই। রাজনৈতিক প্রচার এবং এক্সপোজারকে ছাপিয়ে গেছে মিডিয়া অনেকদিনই।

কিন্তু সমস্ত কিছুর মতো মিডিয়া, বিশেষত বড়ো ও কর্পোরেট মিডিয়াও আজ প্রতিষ্ঠান। পুঁজি, ক্ষমতা এসবের সঙ্গে তার গলাগলি। সে নিজেই তো ক্ষমতা। এক লহমায় লক্ষ লক্ষ লোকের কাছে সে পৌঁছে যায়। মিডিয়ার দখল যে রাখতে পারে সে বা সেই গোষ্ঠী নিজের মতো করে সাজানো কথাগুলো অনেক মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারে। কর্পোরেট মিডিয়া তো নিজেই একটি পুঁজি প্রতিষ্ঠানও বটে। যত সে ক্ষমতাবানের দলে ঢুকে পড়ছে, তত তার এক্সপোজারের থেকে বাদ পড়ে যাচ্ছে ক্ষমতাবান প্রতিষ্ঠান, কর্পোরেট পুঁজি, সর্বোপরি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা। একটা মুখ্যমন্ত্রী বা একটা রাষ্ট্রমন্ত্রী বা একটা শিল্প প্রতিষ্ঠানের মতো ক্ষমতার দু-এক টুকরোকে এক্সপোজ করতেই দূরবীন দিয়ে খুঁজতে হচ্ছে বড়ো কর্পোরেট মিডিয়াকে। বেশিরভাগই নাকি সটান বলে দেন, হবে না। মনে পড়ে পেজ থ্রি সিনেমায় বোমান ইরানি অভিনীত দৈনিক সংবাদপত্র সম্পাদকের চরিত্রটি কঙ্কনা সেন অভিনীত সাংবাদিককে সটান বলে দিলেন, এক নামজাদা শিল্পপতির শিশু ধর্ষণের চিত্রসহ খবরটি পরের দিন কাগজে বেরোবে না। অতঃপর?

এখানেই, এই পরিসরটিতেই দ্রুত উঠে এসেছে ইন্টারনেট। যার একটি উদাহরণ উইকিলিকস। ইন্টারনেট পরিসরটির আরেকটি বড়ো বৈশিষ্ট্য, এটা ভৌগোলিক সীমানা মানে না। অর্থাৎ যে জানতে চায় সে জানতে পারে সহজেই। লাগে না পয়সাও। যেমন উইকিলিকস যে মার্কিন দূতাবাসগুলির নথি ফাঁস করেছে, তা যদি কাগুজে হত, তবে তা বইতে লাগত কয়েকটি ট্রাক। এছাড়া ইন্টারনেট বা ডিজিটাল পরিসরের আরও একটি সুবিধা আছে, সেখানে কোনও একটি বিশেষ জিনিস খুব সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়, ওই শব্দ বা শব্দ সমষ্টি 'সার্চ' দিয়ে।

এই ইন্টারনেট পরিসরটিতেও রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ বা বিধিনিষেধ কাজ করে — সেনসরশিপের বিভিন্ন নমুনা দেখা গেল এই উইকিলিকস পর্বে। চীন যেমন উইকিলিকস নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। থাইল্যান্ডও তাই। এসব দেশের কম্পিউটার থেকে উইকিলিকস পরিসর বা ওয়েবসাইটটিতে ঢোকা যায় না। মার্কিন বা অন্যান্য 'মুক্ত দুনিয়া'তে এই সেনসরশিপ অনেক সূক্ষ্ম, এবং অনেক হাড় হিম করা। উইকিলিকস ওয়েবসাইট এবং তাদের অন্তত চার পাঁচজন সংগঠকের পারিশ্রমিকের টাকা আসে লোকের দান বা ডোনেশন থেকে। ইন্টারনেটে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে ডোনেশন দেওয়া যায় বা পয়সা দেওয়া যায়। এই পরিষেবা প্রদানকারী একটি জগদ্বিখ্যাত সংস্থা পে প্যাল। তারা ২০১০-এর জানুয়ারি মাসে কিছুদিনের জন্য এবং মার্কিন দূতাবাসের নথি প্রকাশের পর থেকে এক্কেবারে সেই পরিষেবা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে উইকিলিকসকে। ভিসা কোম্পানি তার ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করতে দেবে না বলে দিয়েছে উইকিলিকসকে দান করার জন্য। এছাড়া আমরা যখন ইন্টারনেটে কোনও একটা ঠিকানা লিখি সেখানে পৌঁছনোর জন্য, যাকে বলে ওয়েবসাইটের নাম, তা দেখাশোনা করে একটি স্বাধীন মার্কিন সংস্থা, নাম আইকান। তারা উইকিলিকস ডট অর্গ নামে যে ইন্টারনেট ঠিকানা, সেটা তুলে দিয়েছে। ফলে ইন্টারনেটে উইকিলিকস পরিসরটিতে যেতে গেলে একটি সাত-আটটি সংখ্যার নম্বর, যা কি না যে কম্পিউটারে উইকিলিকসের সম্ভার রয়েছে তার নম্বর, সেই নম্বরটি লিখলে তবেই যাওয়া সম্ভব। সেখানেও সেনসরশিপ এসেছে। উইকিলিকস-এর সম্ভার ছিল জগদ্বিখ্যাত কোম্পানি অ্যামাজন ডট কম-এর একটি কম্পিউটার ভাড়া নিয়ে। তারা সেই কম্পিউটারটিকে আর ব্যবহার করতে দিচ্ছে না। কারণ হিসেবে তারা বলেছে, তাদের ভয় দেখানো হচ্ছে মার্কিন রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে। এছাড়া ফরাসী দেশের একটি কোম্পানির কম্পিউটারেও রাখা ছিল এই সম্ভার। তারাও সেই কম্পিউটারটি আর ব্যবহার করতে দিচ্ছে না। শোনা যায়, উইকিলিকসের আসল ভাঁড়ার সুইডেনের একটি কম্পিউটার, যেটা নাকি মাটির নিচে বাঙ্কারে রাখা থাকে। সুইডেনের আইন অনুযায়ী সেখানে রাখা কোনও কম্পিউটারে নথিতে সেখানকার রাষ্ট্র কোনওভাবেই হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। তাই সেই দেশে রাখা হয়েছে।

তবে এত কিছু করেও কিন্তু উইকিলিকসের কাজ থামানো যায়নি। আর সেখানেই ইন্টারনেট পরিসরটির অসামান্যতা। বিভিন্ন রাষ্ট্রের দমন আঁচ করেই উইকিলিকস তার যাবতীয় নথি পৃথিবীর অন্তত তিন লক্ষ উইকিলিকস প্রেমীকে দিয়ে দিয়েছেন, যারা চেয়েছে সেগুলো — সুরঙ্গপথে। সুরঙ্গ পথ মানে হল, যা ইন্টারনেটের রাজপথে দেওয়া হয় নি। দেওয়া হয়েছে কম্পিউটার থেকে কম্পিউটার পরিবহণের মাধ্যমে, যার পরিভাষা পিয়ার টু পিয়ার আর ইন্টারনেটের রাজপথের মালিকরা, সে আইকান-ই হোক, বা বিভিন্ন পরিষেবা প্রদানকারী কর্পোরেট, তাদের ভাষায় এটা পাইরেটেড কপি।

৩

উইকিলিকস না হয় তার ইন্টারনেট পরিসরে নথি ফাঁস করল, অর্থাৎ কি না জনসাধারণের দর্শনের জন্য রাখল। তারা হচ্ছে এই ফাঁসের চক্রে দ্বিতীয় সারি। প্রথম সারি, অর্থাৎ যারা আক্ষরিক অর্থে ফাঁস করছে, তারা তো সর্ষের মধ্যে ভুতের দল। অর্থাৎ ব্র্যাডলি ম্যানিং-এর মতো লোকেরা, যারা প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই কাজ করে, এই সমস্ত নথি নিয়ে কারবার করে। তারাই আবার ফাঁস করে দেয় এইসব নথি। ব্র্যাডলি ম্যানিং হলেন ২২ বছর বয়সী মার্কিন সামরিক বাহিনীর সদস্য। মার্কিন বোমারু বিমান ইরাকে ২০০৭ সালের জুলাই মাসে গুলি করে মেরে ফেলেছিল দুই জন রয়টারের সাংবাদিককে, সেই ঘটনা একটি সাফল্য হিসেবে রুটিনমাফিক ভিডিওতে ধরে রেখেছিল মার্কিন সামরিক বাহিনী,

ওই বিমান থেকে তোলা ভিডিও। সেই ভিডিও ফাঁস করে দেয় ম্যানিং, তা উইকিলিকসে আসে ২০১০ সালের এপ্রিল মাসে। এরকম ভাবেই আবু ঘ্রাইব কারাগারে ইরাকি বন্দীদের ওপর অত্যাচারের দৃশ্যও ফাঁস হয়েছিল মার্কিন সেনাবাহিনীর ভেতর থেকেই। যদিও তখন উইকিলিকস ছিল না।

ম্যানিং ইরাকে পোস্টিং পান ২০০৯ সালে, একুশ বছর বয়সে। ইরাকের আগ্রাসী মার্কিন সেনাবাহিনীর সঙ্গে তিনি মানাতে পারেন নি। কিছুদিনের মধ্যেই এক সহযোদ্ধার সঙ্গে ঝামেলার কারণে তাঁর পদাবনতি হয়। তাঁর ব্যবহার ঠিক 'সঙ্গত' নয়, তাও লক্ষ্য করেছিল মার্কিন সেনা কর্তৃপক্ষ। ম্যানিং একটি ইন্টারনেট পরিসর ফেসবুকে তাঁর নিজের পাতায় লিখেছিলেন — এ যুদ্ধ তাঁর পছন্দ নয়, বড্ড বেশি হারাতে হচ্ছে, বড্ড তাড়াতাড়ি। তারপরেই এই ভিডিও ফাঁসের ঘটনা, মার্কিন সেনাবাহিনীর গোপন নথির ভাঁড়ারের পরিসর 'এস আই পি আর নেট' থেকে কপি করে। সম্ভবত মার্কিন দূতাবাসগুলির নথি ফাঁসও তাঁরই কীর্তি। এরপর অবশ্য তিনি ধরা পরে যান — এক বন্ধু, যাকে তিনি বিশ্বাস করে এসব বলেছিলেন, তাঁর বিশ্বাসঘাতকতায়। দোষী প্রমাণ হলে তাঁর মার্কিন আইনে বাহান্ন বছর সাজা হওয়ার কথা।

তথ্য ফাঁসে প্রথম সারি ম্যানিং-রা, দ্বিতীয় সারি উইকিলিকস। কিন্তু শোর মাচাতে হলে, প্রচারে আনতে হলে সেই কর্পোরেট মিডিয়াই ভরসা। তাই, কর্পোরেট মিডিয়াই এই ফাঁসে তৃতীয় সারি। উইকিলিকস যেমন ইংলন্ডে গার্ডিয়ান, আমেরিকায় নিউ ইয়র্ক টাইমস, ফ্রান্সে ল্য মন্দ, জার্মানির ডের স্পাইজেল এবং স্পেনের এল পাই নামের বামঘেঁষা বড়ো কর্পোরেট মিডিয়াগুলির সাথে চুক্তি করেছিল এই দূতাবাসের নথি ফাঁসের আগে — তারা এই নথি ধীরে ধীরে তাদের কাগজে প্রকাশ করবে। এবং তার জন্য আগে থেকেই তাদের এই নথির কপি দিয়ে দেবে উইকিলিকস।

এরপর বড়ো করে লোক জানাজানি হল। কয়েকদিন খুব কাগজে লেখালেখি চলল। কিন্তু, এর ফলে যে চালু আন্তরাষ্ট্রীয় প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে কোনও মানবিক পরিবর্তন হল, তা কিন্তু নয়। বরং প্রতিটি রাষ্ট্র ব্যস্ত হয়ে পড়ল, কীভাবে তাদের নথি আরও ভালোভাবে গোপন রাখা যায় তা ঠিক করতে। মার্কিন রাষ্ট্র তাদের সরকারি কর্মচারীদের বলল, খবরদার উইকিলিকসে কী লেখা আছে তা পড়বে না, কারণ এগুলো এখনও 'ক্লাসিফায়েড' নথি, গোপন নথি। তবে রাষ্ট্রীয় নীতিতে কিছু পরিবর্তন নজরে পড়ল না। কোনও রাষ্ট্রনায়ক পদত্যাগ অবধি করলেন না। বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানরা, নেতারা নিজেদের মধ্যে ফোনে কথা বলে বা প্রেস বিবৃতি দিয়ে মিটিয়ে নিলেন বিরোধ। কাগজে দেখা গেল, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ওবামা ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট এবং তুর্কির প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দূতাবাসের নথির ফাঁসের বিষয় নিয়ে কথা বলে নিয়েছেন। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার পরিসরে প্রায় কোনও ঢেউই তুলতে পারল না এই ফাঁস, যা নাকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সবচেয়ে বড়ো ফাঁসের ঘটনা।

৪

এখানেই প্রশ্ন এসে যায়, এই এক্সপোজারে কি কিছু লাভ হল? এরই সঙ্গে এসে যায়, আরও একটি গভীরতর প্রশ্ন, এক্সপোজারের কি কিছু লাভ হয় আজকাল? পাতি লোকে কি রাজনৈতিক নেতা, বিচারশালা, কর্পোরেট গোষ্ঠীর নীতিহীনতা এবং দেউলিয়াপনা সম্পর্কে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং লোকমুখের চর্চা থেকে যথেষ্ট প্রাজ্ঞ নয়? ক্ষমতার কারবারীদের লোকলজ্জা বলে কি কোনও বস্তু আছে?

এ প্রসঙ্গে মার্কিন তথ্যচিত্র নির্মাতা মাইকেল মূর খুব আশাবাদী। তাঁর মতে, যদি ইরাক যুদ্ধের শুরুর সময় এই ধরণের ফাঁস ঘটানো সম্ভব হত, তাহলে যুদ্ধটাকে আটকানো যেত। ভবিষ্যতে উইকিলিকস বা তার মতো পরিসরগুলি আরও কোনও বড়ো অঘটনের হাত থেকে মানবতাকে বাঁচাতে পারবে। অর্থাৎ মাইকেল মূর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিবাদী তথ্যচিত্র নির্মাতা, গত মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বুশের বিরুদ্ধে ওবামার 'পরিবর্তন'-এর আওয়াজের সমর্থক, মনে করেন, সঠিক সময়ে সুনির্দিষ্ট এক্সপোজার বা রাজনৈতিক এক্সপোজার মানবতার পক্ষে লাভজনক। তা এমনকি যুদ্ধের মতো রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার চরমতম প্রকাশকেও আটকে দিতে সক্ষম।

ব্র্যাডলি ম্যানিং নাকি বলেছিলেন তাঁর ওই বন্ধুকে, 'আমি চাই লোকে সত্যটা জানুক। কারণ সত্য না জানলে তুমি একজন পাতি মানুষ হিসেবে ('অ্যাজ এ পাবলিক' কথাটা ব্যবহার করেছিলেন ম্যানিং) সিদ্ধান্তটা নিতে পারবে না।' আরও বলেছিলেন, 'আশা রাখি, এর ফলে পৃথিবীব্যাপী আলোচনা, তর্ক, এবং সংস্কার হবে'।

অর্থাৎ এই ফাঁসের মূল নায়কের লক্ষ্য কিন্তু আশু কোনও 'পরিবর্তন' নয়, বরং জনসমাজের 'তর্ক, আলোচনা, সংস্কার'। ওই কথোপকথনেই তাঁর বন্ধুকে তিনি বলেন, তিনি তো খারাপ কাজ করতে পারতেন, ওই সব নথি চীন বা রাশিয়ার রাষ্ট্রকে বিক্রি করতে পারতেন। কিন্তু তা তিনি করেননি। কারণ, তিনি চান এই সব নথি 'পাবলিক ডোমেইন' বা জনসমক্ষে থাকা দরকার। এইসব নথি মুক্ত অবস্থায় থাকা দরকার। তাই তিনি এইসব নথির কপি তুলে দিয়েছেন সাদা চুলের এক অস্ট্রেলিয়ানের হাতে। ধরে নেওয়া হচ্ছে, এই সাদা চুলের অস্ট্রেলিয়ানই হলেন উইকিলিকস-এর সংগঠক জুলিয়ান আসাঙ। ব্র্যাডলি ম্যানিং যখন সাদা চুলের অস্ট্রেলীয়কে এই নথি তুলে দেন ২০১০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে, তখন ক'জনই বা জানত উইকিলিকসের নাম? উল্লেখ্য, ২০০১ সালের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে টুইন টাওয়ারে সন্ত্রাসী হামলার সময়ের কয়েক হাজার মোবাইল মেসেজ উইকিলিকসে ফাঁস করা দেখে ২০০৯ সালের নভেম্বর মাসে ব্র্যাডলি ম্যানিং জুলিয়ান আসাঙ-এর সাথে প্রথম যোগাযোগ করেন। সে অর্থে অনামী এক লোক, অনামী এক উদ্যোগের হাতে এই নথি তুলে দিয়েছিলেন ব্র্যাডলি। তিনি কিন্তু সরাসরি নিউইয়র্ক টাইমস, গার্ডিয়ান, ল্য মন্দ প্রভৃতিদের মতো বামঘেঁষা বড়ো কর্পোরেট মিডিয়াকে এই নথি দেননি। ক্ষমতার পরিসরে নয়, জনসমাজের পরিসরেই এই নথিগুলি নিয়ে চর্চা হোক, লোকে জানুক আগে, তারপর ভালোমন্দ বিচার করুক বা কোনও বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিক — এরকমই চাহিদা ম্যানিং-এর।

ক্ষমতা নিয়ে নয়, রাষ্ট্র নিয়ে নয়, দল বা রাজনীতি নিয়ে নয়, কূটনীতি নিয়ে নয়, মিডিয়া নিয়ে নয়, বাইশ বছরের ব্র্যাডলি ম্যানিং হতাশ ছিলেন বৃহত্তর জনসমাজ নিয়েই। ২০১০ সালের ৫ মে ফেসবুকে নিজের পাতায় তিনি লেখেন, তিনি 'মানুষ এবং বৃহত্তর সমাজ নিয়ে হতাশারও ঊর্ধ্বে (ইংরেজিতে 'বিয়ন্ড ফ্রাসট্রেটেড')'। তাঁর কথায়, এই ফাঁসগুলি নিয়ে 'পৃথিবীব্যাপী তর্ক, আলোচনা, সংস্কার ... যদি না হয়, ... তাহলে আমরা শেষ... প্রজাতি হিসেবেই... যদি কিছু না হয়, তবে আমি এই সমাজের প্রতি অফিসিয়ালি সব আশা ছেড়ে দেব ...'। ২৫ মে বন্ধুর সঙ্গে ইন্টারনেট কথোপকথনে তিনি বলেন, বাগদাদের আকাশহানার 'ভিডিওটি নিয়ে যে প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তাতে আমার ভীষণ আশা জাগছে... সিএনএন আই-রিপোর্ট ছেয়ে গেছে, ... টুইটারে যেন বিস্ফোরণ হচ্ছে ...'। উল্লেখ্য, সিএনএন নামক মার্কিন কর্পোরেট বড়ো মিডিয়ার আই-রিপোর্ট বলে একটি পরিসর আছে, যেখানে পাতি মানুষ তার প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে এবং সেগুলো থেকে নিয়েই খবর হয় ওই পরিসরে। আর টুইটার হল একটা ইন্টারনেট পরিসর, যেখানে যে কেউ বিনে পয়সায় একটা নিজের পাতা খুলে সেখানে যা খুশি লিখে বন্ধুবান্ধবদের পাঠাতে পারে। এগুলি

জনসমাজের চর্চা, তর্ক, গুঞ্জন ধারণ করার ইন্টারনেট পরিসর। ওপরে উল্লিখিত ফেসবুকও অনেকটা টুইটারের মতোই। জুনের প্রথম সপ্তাহে ব্র্যাডলি ম্যানিং গ্রেপ্তার হন, ইন্টারনেট কথোপকথনের বন্ধু আদ্রিয়ান ল্যামো এসব কথা মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাকে বলে দেওয়ার পর।

৫

আমরা অবশ্য আশেপাশে দেখি এক্সপোজারের রাজনীতির প্রাবল্য। র‍্যাডিক্যাল রাজনীতিকে অনেকেই অভিযুক্ত করে, এটা শুধু অন্যদের নিন্দে করে, কাউকে বাদ রাখে না। আর সংসদীয় রাজনীতি তো সবচেয়ে বেশি সময় ব্যয় করে প্রতিপক্ষ কত খারাপ তা প্রমাণ করতে। যেন মনে হয়, তার অস্তিত্ব প্রতিপক্ষের অধীন। নিজের স্বাধীন রাজনৈতিক এজেন্ডা বা অবস্থান খুব কমই দেখা যায়। এক্কেবারে দেউলিয়া হয়ে যাওয়া রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার রাজনীতিতে সেসবের আর দরকার পড়ে না। আমাদের আশেপাশের ক্ষমতার রাজনীতির পরিসরের সিংহভাগ জুড়ে আছে এক্সপোজার এবং প্রচারের রাজনীতি। যদিও এই ব্যাপারে তারা বড়ো ও কর্পোরেট মিডিয়ার কাছে কোণঠাসা। মাইকেল মূর কথিত রাজনৈতিক এক্সপোজারের ঠাঁইও এই পরিসরে খুব একটা দেখা যায় না।

ব্র্যাডলি ম্যানিং একটি অন্য কথা বলেছেন, যা নথি ফাঁসকে এক্সপোজারের গণ্ডি থেকে বাইরে বার করে এনেছে। এমনকী তাকে পরিচিত রাজনীতির সীমানাকেও অতিক্রম করিয়ে দিয়েছে। দিয়েছে এক সামাজিক পরিসর।

উইকিলিকসে ফাঁস হওয়া মার্কিন দূতাবাসের নথিগুলির কিছু সংক্ষিপ্ত নমুনা (বন্ধনীতে নথির সাল উল্লিখিত) :

❑ ছয় বছর আগে তৈরি হওয়া বাংলাদেশের সরকারি খুনে বাহিনী রেব (র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়ন), যারা বেআইনি ভাবে হাজারেরও বেশি স্বদেশীয়কে খুন করার দায়ে অভিযুক্ত, তাদের গোপনে প্রশিক্ষণ দিয়েছে ব্রিটিশ সরকার। (২০০৮)

❑ ইরানের আহমদিনেজাদ সরকারকে সরানোর জন্য আমেরিকাকে ইরান আগ্রাসনের পরামর্শ দিয়েছিল বেশ কয়েকটি আরব দেশ, যারা প্রকাশ্যে ইরানের বন্ধু। (২০০৯)

❑ কাশ্মীরে ধৃত সাধারণ নাগরিককে পুলিশি হেফাজতে পেটানো এবং ইলেকট্রিক শক দেওয়ার বন্দোবস্ত করেছে ভারত সরকার। (২০০৫)

❑ শ্রীলঙ্কা সরকার পাঁচজন ডাক্তারকে চাপ দিয়েছিল, যাতে তারা সাংবাদিকদের এলটিটিই-র সঙ্গে শ্রীলঙ্কা রাষ্ট্রের যুদ্ধের শেষ দিনগুলিতে হতাহতের পরিমাণ কমিয়ে বলে। (২০০৯)

❑ বৃহত্তম ওষুধ কর্পোরেট ফাইজার নাইজেরিয়া মানুষের ওপর একটি ওষুধের পরীক্ষা করাতে গিয়ে অনেক মানুষ মেরে ফেলে। তার বিচার হচ্ছিল নাইজিরিয়ার কোর্টে। সেই বিচারে যাতে তাড়াতাড়ি না হয়, সে জন্য নাইজেরিয়ার অ্যাটর্নি জেনারেলের দুর্নীতির প্রমাণ জোগাড়ের জন্য গোয়েন্দা ভাড়া করেছিল ফাইজার। (২০০৯)

❑ চীনা সরকার চায়, উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া মিলে যাক। (২০১০)

❑ বুলগেরিয়ার সবচেয়ে নামী পরমাণু শক্তি প্রকল্প, বেলেন নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট (বিএনপিপি) ধুঁকছে, খরচ বেশি, পুঁজি বেশি লাগছে, নির্মাণে দেরী, নিরাপত্তার সঙ্কট এবং উৎপাদিত বিদ্যুৎ ভালো নয়। (২০০৯)

❑ ব্রিটেনে ক্লাস্টার বোম নিষিদ্ধ, কিন্তু ব্রিটিশ বিদেশ সচিব গোপনে ব্রিটিশ ভূখণ্ডে মার্কিন ক্লাস্টার বোম জমিয়ে রাখার বন্দোবস্ত করেছে। (২০০৯)

অন্ধ্রপ্রদেশের মাওবাদী আন্দোলন

প্রয়াত কে. বালাগোপালের এই প্রবন্ধটি 'ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিকাল উইকলি' পত্রিকায় ২২ জুলাই ২০০৬-এ প্রকাশিত হয়েছিল। প্রাসঙ্গিকতার বিচারে এটির অংশবিশেষ বাংলা অনুবাদ করে এখানে প্রকাশ করা হল। অনুবাদক অমিতাভ সেন।

ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি (মাওবাদী) দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক মুপাল্লা লক্ষণ রাও, যাঁকে গণপথি নামেই বেশি লোক জানে, তাঁর নিজের গ্রামের নাম বীরপুর। এই গ্রামটা করিমনগর জেলার উত্তর কোণে গোদাবরী নদীর তীরে অবস্থিত। চন্দ্রবাবু নাইডুর আমলে রাজ্য জুড়ে রাস্তা বানানোর বাতিক ছড়িয়ে পড়ার আগে এই গ্রামে ঢোকাটাই ছিল ভীষণ কঠিন। তেলেঙ্গানার নিজামাবাদ থেকে ছত্তিশগড়ের জগদলপুর পর্যন্ত অসমাপ্ত ১৬নং জাতীয় সড়কের পাশে যে ধরমপুরী নামক মন্দিরনগরী রয়েছে, সেখান থেকে একটা কালো পিচের রাস্তা ধরে ওই গ্রামে এখন যাওয়া যায়। আপনি যদি ধরমপুরি থেকে বীরপুর যান, তাহলে দেখতে পাবেন গ্রামের প্রবেশপথে একটা সাদা স্মারকস্তম্ভের ওপর দুটো পায়রা শান্তির প্রতীক হয়ে বসে আছে। এই সাদা স্তম্ভ আর তার মাথার সাদা পায়রাগুলোর বিপরীত সাদৃশ্যে সারা তেলেঙ্গানা জুড়ে ছড়িয়ে আছে অজস্র লালরঙা স্মারকস্তম্ভ, যাদের মাথায় স্থাপিত রয়েছে একটা করে হাতুড়ি আর কাস্তে। উত্তর তেলেঙ্গানার গোদাবরী নদী তীরবর্তী এলাকা, যেখানে মাওবাদীদের শক্ত ঘাঁটিগুলো ছিল, সেখানটা যে এখন পুলিশবাহিনীর কব্জায় এবং নিজেদের এই কৃতিত্বে খুশি হয়ে তারই স্মারক হিসেবে এই সাদা স্মারকস্তম্ভটি সম্প্রতি পুলিশবাহিনী বানিয়েছে। এটা যে সর্বোচ্চ মাওবাদী নেতার গ্রামেই স্থাপন করা হয়েছে এবং এর উদ্বোধন করা হয়েছে — শান্তির প্রতীক হিসেবে সবচেয়ে বেমানান — করিমনগরের পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্টকে দিয়ে। এটা এমনই এক ছেলেমানুষীর ইঙ্গিত, যাকে অন্য কোন প্রেক্ষিতে নেহাত রুচিহীন চ্যাঙড়ামি মনে হতে পারে, কিন্তু এটা একটা অশান্তিজনক সত্যের প্রতীক : পরপর সবক'টা অন্ধ্রপ্রদেশের সরকারের নকশালদের প্রতি রাজনৈতিকভাবে অপরিণত মনোভাবের পরিচায়ক।

বলতে গেলে এই অঞ্চলের বহু মানুষের কাছেই শান্তি খুব আকাঙ্ক্ষিত। কিন্তু খুব স্বল্পসংখ্যক মানুষ আছে, যারা খুব খুশি, কারণ এর আগে মাওবাদীদের কখনও এতটা পিছু হটানো যায়নি। এদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষ, হয়তো তারা তত বাস্তববাদী নয়, কিন্তু তারা চাইবে যে মাওবাদীরা চারপাশে থাকুক, বন্দুক-টন্দুক নিয়েই, কিন্তু জীবনের মধ্যে যেন একটা শান্তি থাকে, ভয়ের কিছু না থাকে — এ পক্ষ সরকার ও মাওবাদীদের মধ্যে যে আলাপ-আলোচনার প্রহসন চলেছিল, সেই সময় যে অঞ্চলগুলোতে দীর্ঘদিন ধরে নকশালদের ঘাঁটি ছিল, সেখানে একটা কথা উঠেছিল যে আলাপ-আলোচনা ভালো জিনিস, তাতে হিংসাত্মক ঘটনা কিছু কমতে পারে, কিন্তু 'ওরা আমাদের ছেড়ে চলে যাবে না। ওরা কি ছেড়ে চলে যেতে পারে?'

এটা সত্যি ঘটনা যে এই অঞ্চলের সাধারণ মানুষ তাদের অভিজ্ঞতায় এই প্রথমবার, যাকে ন্যায় বলা হয়, তার কাছাকাছি কিছু দেখতে পেয়েছিল, যখন নকশাল আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল এবং জনগণকে শেখানো হয়েছিল যে অন্যায় কিছু হলে তা মাথা পেতে মেনে নিতে হয় না। অন্যান্য যে অঞ্চলগুলোতে নকশালপন্থীরা সশস্ত্র বাহিনী সহযোগে ছড়িয়ে পড়েছিল, সেগুলোর থেকে আলাদাভাবে উত্তর তেলেঙ্গানায় ১৯৭০–এর দশকের শেষদিকে এবং ১৯৮০–র দশকের গোড়ায় প্রধানত খেতমজুরদের সংগঠন এবং ছাত্র–যুব সংগঠন সহ বিভিন্ন গণসংগঠনের মাধ্যমে মাওবাদের আদর্শ ও রাজনৈতিক কর্মসূচি গড়ে তোলা হয়েছিল। এই অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটে এবং জনসাধারণ ন্যায্যতা আদায়ের জন্য সশস্ত্র বাহিনীর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। কিন্তু ন্যায্যতা আদায়ের চেতনা একটা মৌলিক পরিবর্তন এনে দেয়। সোজা করে বললে, প্রথমে জাগ্রত জনতার ক্ষোভকে এবং পরে গ্রামের দরিদ্র পরিবার থেকে আসা সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের স্থানীয় সমাজের নিপীড়কেরা — – তা সে উচ্চবর্ণের জমিদার বা হৃদয়হীন সরকারি অফিসার যেই হোক — সকলেই ভয় পেতে শুরু করে। আজকে পুরনো জমিদারেরা আর নেই, কিন্তু নতুন স্থানীয় অভিজাত ও আলোকপ্রাপ্তরা সামনে এসে গেছে এবং একটা ভয় ছড়িয়ে পড়েছে যে নকশালপন্থীরা যদি চলে যায়, 'গরিবেরা আর বাঁচতে পারবে না।' এটা একটা বেছে নেওয়ার ব্যাপার যে কে কোনভাবে এটাকে দেখবে — একটা রবিনহুড ধাঁচের বিপ্লব অথবা শুধুমাত্র মাওবাদী লঙ মার্চের গাথার একটা উদাহরণ মাত্র, যাকে প্রতিনিধিত্বমূলক আন্দোলন হিসেবে ধরা যায় না।

রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন

প্রথম থেকেই অন্ধ্রপ্রদেশ সরকারের মনোভাবটা ছিল চূড়ান্ত শত্রুতামূলক। গ্রামে গ্রামে পুলিশ চৌকি বসানো হয়েছিল এবং গরিবদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার চালানো হচ্ছিল। এটা সর্বদা ও স্পষ্টতই ছিল একটা রাজনৈতিক আক্রমণ। ওইসব এলাকায় পুলিশের যারা ভারপ্রাপ্ত ছিল, তারা সত্য কখনও গোপন করেনি যে তারা — যেমন বলা হয়ে থাকে — 'কেবল আইনশৃঙ্খলা রক্ষা'–ই করছিল না, বরং তাদের রাজনৈতিক দায়িত্ব ছিল জোতদার ও মধ্যযুগীয় সমাজকাঠামোকে রক্ষা করা এবং সেটা তারা পালন করছিল। তখন নকশাল কর্মীরা গোপন সংগঠনে অবশ্যই সশস্ত্র ছিল, কিন্তু তখন তাদের হিংসাত্মক কার্যকলাপ যথেষ্ট সীমিত ছিল এবং বেশ কিছুটা বাছাই করেই কিছু ক্ষেত্রে তারা সশস্ত্র হামলা চালায়। অপরপক্ষে যারা জানে তারা সবাই বলে, এমনকী কিছু অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসাররাও বলে, তখনকার নকশালদের লড়াইটা ছিল সাধারণভাবে সামন্তদের আধিপত্য ও গরিবদের ওপর অর্থনৈতিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে এবং এই কাজে তারা উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছিল। 'বেগার প্রথা'–র অবসান এবং 'প্রাপ্য নিম্নতম মজুরি'–র কাছাকাছি মজুরি পাইয়ে দেওয়ার যে দুটো কাজ — নিষ্পাপ সাংবিধানিক কাজ — সেগুলো নকশালরাই করে দিয়েছিল।

জমির জন্য লড়াই ততটা সফল হয়নি। কারণ, জমিদারদের উৎখাত করে তাদের জমিতে গরিব কৃষকদের চাষ করতে পুলিশ বাধা দিয়েছিল। এই ধরনের জমিগুলো বর্তমানে মোটের ওপর অনাবাদী হয়েই পড়ে রয়েছে। কিন্তু যে কোন দিক দিয়ে বিচার করলেই এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়, কারণ জেলাতে মোট চাষযোগ্য জমি যতটা আছে, তার তুলনায় এবং ভূমিহীনদের যতটা দরকার সেই হিসেবেও ওই জমির পরিমাণ খুব কম। ...

লিটল ম্যাগাজিনে বিরুদ্ধ মতপ্রকাশের পরিসীমা ... ২ পৃষ্ঠার শেষাংশ

কোন যৌক্তিকের বিতর্কের যোগ্য বিষয় বলে মান্যতা দিতে পারি না। ছেপে প্রচারের সুযোগ দিলে সেই মান্যতা এরা পেয়ে যায়, এটা সম্পূর্ণ মতিভ্রম ছাড়া কিছু নয়।

এরকম ক্ষেত্রেও কিন্তু মতপ্রকাশের স্বাধীনতা খর্ব করা হচ্ছে না। শুধু বলা হচ্ছে, তোমরা তোমাদের প্রকাশের মাধ্যম ঠিক করে নাও, কিন্তু আমাদের পত্র–পত্রিকায় তোমাদের প্রচার ও পরিচিতির জায়গা করে দিতে পারব না। পত্রিকার পরিসর হাটের মতো উন্মুক্ত নয় যে, যে–কেউ মতপ্রকাশের স্বাধীনতার নাম করে আমাদের অবাঞ্ছিত লেখাও ছাপিয়ে নেবে। সেই সঙ্গে দাবি করবে তোমরা প্রতিবাদ করো, বিতর্ক চলুক। কী ছাপা হবে, কী নিয়ে বিতর্ক চলবে, কীসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম — এসব নির্ধারণ করার স্বাধীনতা নির্দিষ্ট পত্রিকারই আছে। আগে যে মানবিক মহা দিগন্তের কথা বলা হয়েছে তার পরিসরে নানা মতের বিতর্ক সবসময় কাম্য। যখনই মানবিক বৃত্ত ছাড়িয়ে কোন দুর্বৃত্ত মত দেখা দেয়, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও হুঁশিয়ারি দেওয়াটাই কর্তব্য হিসেবে দেখা দেয়।

শেষ প্রশ্ন : মতপ্রকাশের স্বাধীনতা কি পরিপ্রেক্ষিত বিচ্ছিন্ন

চলতি সমাজে ক্ষমতাতন্ত্র মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে নানাভাবে খর্ব করে রেখেছে। এই খর্বায়নের পরিপ্রেক্ষিতে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর এত গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই গুরুত্বের কথা খেয়ালে রেখেও বোঝা দরকার, এখানেও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা অবাধ হতে পারে না। আমরা সভ্যতার অনেক সম্পদ ও বর্বরতার অনেক বোঝা নিয়ে এতদূর এসেছি। স্বআরোপিত শৃঙ্খলা ও সহযোগিতা যে সমাজে শ্বাসবায়ুর মতো স্বাভাবিক, তেমন সমাজের জন্য অনেক দূর হাঁটতে হবে। সেখানেই হয়তো স্বাধীনতা কথাটা প্রকৃত অর্থে দেখা দেবে, এবং পরাধীনতার পরিপ্রেক্ষিতের অভাবে প্রশ্নটা গুরুত্বহীনও হয়ে পড়বে। কিন্তু এখন মতপ্রকাশের স্বাধীনতা স্থান, কাল ও পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতেই প্রযোজ্য অথবা অপ্রযোজ্য। এমনকী বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মানুষের অগ্রযাত্রার পথিকরা দুর্বৃত্ত মতের প্রকাশের ওপর নিষেধও চাইতে পারে। ধরা যাক কোন এক অগ্নিগর্ভ সামাজিক পরিস্থিতিতে চারপাশে এমন সব হিংসা ও দাহ্যপদার্থ জমা হয়ে আছে যে একটি ফুলকি থেকেই বহু মানুষের প্রাণ ও সামান্য সম্পত্তিটুকু নিশ্চিহ্ন হতে পারে। তেমন ক্ষেত্রে গুজব ও ভুল খবর ভরা প্ররোচক কোন পত্র–পত্রিকার প্রকাশ ও বিতরণ সাধ্যমতো বন্ধ করা উচিত। কারণ মানুষই আমাদের অভীষ্ট। মুক্তির পথে দুর্বৃত্ত মত নিষেধকেও যেন সর্বথা পরিত্যাজ্য বলে মনে না করি।

স্বত্বাধিকারী জিতেন নন্দী কর্তৃক সি–৫৬৪, ফতেপুর প্রথম সরণী, গার্ডেনরীচ, কলিকাতা–২৪ হইতে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রিন্টিং আর্ট, কলি–৯ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক জিতেন নন্দী।
ওয়েবসাইট : http://manthansamayiki.googlepages.com, ই–মেল : manthansamayiki@gmail.com, দূরভাষ : 2491-3666